Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা কাব্যের ভাষা : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.1
Pages	9-39
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা কাব্যের ভাষা : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

Check for updates

ওয়াকিল আহমদ*

ভাষা একটি মাধ্যম, যার সাহায্যে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। রং-তুলি অপর একটি মাধ্যম, যার সাহায্যে একজন চিত্রশিল্পী নিজেকে প্রকাশ করেন। একজন নৃত্যশিল্পী মুদ্রার সাহায্যে অনুরূপভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। ভাষার ব্যাপকতা বিশ্বময়। তবে বিশ্ববাসী এক ভাষায় কথা বলে না; এক জাতির এক বা একাধিক ভাষা আছে, আবার এক ভাষার এক বা একাধিক জাতি আছে। ভাষার প্রয়োগ বিভিন্নমুখী হয়; দৈনন্দিন জীবনে কাজের ভাষা, আলাপ-বিলাপের ভাষা, বাদ-প্রতিবাদের ভাষা, বক্তৃতার ভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা, শিল্প-সাহিত্যের ভাষার রূপ, রীতি, রস ও স্বাদ একরূপ হয় না, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

সাহিত্যের ভাষা দ্বিবিধ — গদ্য ও পদ্য। গদ্যরচনায় প্রতিবন্ধকতা কম; পদ্যরচনায় কতক বাধ্যবাধকতা আছে। ছন্দ, মিল, চরণ ইত্যাদি কবিতার আবশ্যক অঙ্গ; বিশেষত প্রাগাধুনিক যুগে সাহিত্যে ছন্দ-চরণ-মিলের বন্ধন ছিল অলঙ্ঘনীয়। ছন্দকে আবার মাত্রা, পর্ব ও মধ্য-অন্ত্যমিলের শাসন মানতে হত। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত নামে যেমন মাত্রাভেদে ছন্দভেদ আছে, তেমনি দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী নামে চরণভেদে ছন্দভেদ আছে। এসব হলো পদ্যছন্দের অভ্যন্তরীণ অনুশাসন।

কবিতাকে কবিতা হতে হলে আবার বিবিধ অলংকার-সাজে সাজতে হয়। কাব্যে অলংকারের প্রাধান্য থেকে প্রাচীন শাস্ত্রকার এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলেন, 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'। — অলংকারমণ্ডিত বাক্য হলো কাব্য। কাব্যে ছন্দ-অলংকারের সব ধরনের ক্রিয়াশীলতা ভাষাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, যার মূলে আছেন 'কবি' নামে একজন সৃজনশীল ও কুশলী ভাষাশিল্পী। তিনি ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে যেমন সম্যক জ্ঞান রাখেন, তেমনি ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা রাখেন। কবিতার ছন্দ, অলংকার ও কলারীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশেষজ্ঞ বলেছেন, The poem has to rely on a number of techniques that will evoke emotions in a reader. The techniques are called poetic devices and may include rhyming, metaphors, similies etc.[১]

কবিতার ভাষা ভাব বা বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা দেয় না, অর্থের ব্যঞ্জনা দেয়। কবিকে অল্পকথায় অধিক কথা বলতে হয়। পি. বি. শেলি কবিতাকে 'দৈব' বলেছেন; তাঁর মতে, কবিতা হলো মানুষের সব ধরনের চিন্তার মূল ও প্রসূন। Poetry is indeed something divine. ...It is at the same time the root and blossom of all the systems of thought.[২] চিন্তা প্রথমে কবির মানসলোকে আসে বিমূর্ত অবস্থায়; তারপর ভাষায় তা বাঙ্ময় রূপ লাভ করে।

---

*অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গদ্যে রচিত উপন্যাসও বাঙ্ময়শিল্প। গদ্যের চাল সহজ ও সচ্ছল হওয়ায় কথাশিল্পী অনেক স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন, যার ফলে উপন্যাস আকারে-প্রকারে ছোট অথবা বড় হতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ গদ্যের ভাষাকে 'মানুষের ভাষা' (language of men) বলেছেন। পদ্যের চাল অবাধ নয়, নিয়মের অধীন; শব্দের ব্যবহারে কবিকে অনেক সংযমী হতে হয়। কবিতার ভাষা উপন্যাসের ভাষা অপেক্ষা অধিক সংযত ও সংহত। Poetry is much more compressed than fiction.[৩]

কবি শব্দকুশলী সন্দেহ নেই। ভাষার 'একক' শব্দ; কবি শব্দ সংগ্রহ করেন ব্যক্তিগত জীবন তথা অভিজ্ঞতা থেকে, তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে, জীব ও জড় জগৎ তথা পারিপার্শ্বিকতা থেকে, আর দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে। শব্দ অভিধানেও থাকে, কিন্তু সেখানে তা থাকে নীরব, নির্জীব, নির্বাক। কবি নিজের আবেগ, অনুভূতি দিয়ে শব্দকে সক্রিয় করে তোলেন এবং কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত করে নতুন তাৎপর্য দান করেন। আলাওল শব্দকে 'মুক্তা'র ও কবিকে 'ডুবারু'র সাথে তুলনা করেছেন। সুক্তির মধ্যে মুক্তা থাকে; কবি ভাষাসমুদ্র থেকে শব্দরূপ মুক্তা আহরণ করে কাব্যমাল্য রচনা করেন।—

কাব্যসিন্ধু শব্দ মুক্তা কবি সে ডুবারু।
বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সুচারু॥

কাব্যে শব্দের এরূপ গুরুত্ব বিবেচনা করে এজরা পাউন্ড বলেছেন, 'শব্দই কবিতা'। স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের ভাষায় — 'best words in their best order.'

এ প্রসঙ্গে Poetic diction বা কাব্যিক শব্দশৈলীর কথা বলতে হয়। 'ডিকশনে'র আভিধানিক অর্থ 'শব্দচয়ন' বা 'শব্দশৈলী' হলেও যখন তা কাব্যে প্রতিফলিত হয়, তখন নানা মাত্রিকতা লাভ করে। এর সাধারণ সংজ্ঞা হলো : Poetic diction is the term used to refer to the linguistic style, the vocabulary, and the metaphor used in the writing of poetry. কবিতায় ব্যবহৃত ভাষারীতি, শব্দভাণ্ডার এবং রূপকাদি অলংকার-সমন্বিত রূপ হলো 'পয়েটিক ডিকশন'। এর অপর সংজ্ঞা হলো: Poetic diction treats the manner in which language is used, and refers not only to the sound but also to the underlying meaning and its interaction with sound and form.[৪]

আমরা কবিতা ও ভাষা সম্বন্ধে এত কথা বললাম এ জন্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে পদ্যের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল লেখার উপযোগী কাগজ-কলম সরঞ্জামাদির অভাব। ছাপাখানার আবিষ্কারও ওই যুগে হয় নি। অনুলিখন ছিল ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। শ্রুতি ও স্মৃতি ছিল সংরক্ষণ ও প্রচারের অন্যতম উপায়। সুর-তালযোগে গান করে প্রচার করা হত। মঙ্গলকাব্য-রামায়ণ-মহাভারতের মতো বিশালাকার কাহিনিকাব্য এভাবে স্মৃতিতে ধারণ ও গান করে পরিবেশন করা হত। শ্রুতিধর গায়েনগণ এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতেন। মধ্যযুগে গদ্যের ব্যবহার থাকলেও তা চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; তাও সংরক্ষণের অভাবে অনেক লোপ পেয়েছে।

বাংলা কাব্যের ভাষা আমরা ভাষাতত্ত্বের আলোকে এ প্রবন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করি নি। আট থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত দীর্ঘ হাজার বছর ধরে কবিগণ স্ব স্ব কাব্যে কিভাবে বাংলা ভাষার প্রয়োগ করেছেন, এখানে তার স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছি। কবিরাই ভাষার সৃজনশক্তির উদ্ভাবক ও রূপকার; তাঁরাই শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিচর্যা দ্বারা বাংলা ভাষার এই সৃজনশীল ও গতিশীল প্রবাহকে ধরে রেখেছেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ভাষার এই রূপ-প্রকৃতি ও গতি-প্রবাহ সম্বন্ধে উত্তরসূরি হিসাবে আমাদের জানা আবশ্যক।

বাংলা ভাষার উদ্ভব-বিকাশ আর বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব-বিকাশ প্রায় সমসূত্রে গাঁথা। অষ্টম-নবম শতকে বাংলাসহ আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটেছিল। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, মাগধী প্রাকৃত থেকে, আর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে। অনেক চর্যাপদকার বাংলা চর্যাপদ ছাড়াও অবহট্ট (<অপভ্রংশ) ভাষায় দোহাকোষ ও সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। অর্থাৎ ওই সময়ে সংস্কৃত, অবহট্ট ও বাংলা ভাষা চালু ছিল। প্রাকৃত ও বাংলা ভাষার মধ্যবর্তী স্তর অবহট্টে (<অপভ্রংশ) দোহাকোষগুলি রচিত হয়। গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে গৌড়ীয় অবহট্ট এবং গৌড়ীয় অবহট্ট থেকে বাংলা ভাষার জন্ম — মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এরূপ অভিমত পোষণ করেন।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। জাতির উত্থান-পতনের সাথে ভাষার উত্থান-পতনের যোগসূত্র রয়েছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালদের আমলে বাংলা ভাষা জন্মলাভ করে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখা সহজিয়ামতের অনুসারীগণ চর্যাপদ রচনা করেন। পালরাজারা সংস্কৃতকে রাজভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। বারো শতকে সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের মধ্যে সবাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার কবি-পণ্ডিত। জয়দেব বাঙালি কবি হয়েও বাংলা ভাষার কবি নন, তাঁর বিখ্যাত কাব্য *গীতগোবিন্দম্* সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তেরো শতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়। বিদেশি-বিজয়ী মুসলিম শাসকেরা ভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির অনুসারী ছিলেন। তাঁদের আরবি হলো ধর্মভাষা, আর ফারসি হলো রাষ্ট্রভাষা। খিলজি বংশের শাসকদের মাতৃভাষা ছিল 'তুর্কি', আরবদেশের শাসকশ্রেণির মাতৃভাষা 'আরবি', পারস্যদেশের শাসকশ্রেণির ভাষা ফারসি, আর আফগাস্তিানে পাঠানদের মাতৃভাষা 'পস্তু'। তাঁদের রাজসভায় বাংলার স্থান আশা করা বৃথা। সাধারণ জনগণ ও সহজিয়ামতের সিদ্ধাদের মতো মাত্র একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে বাংলা ভাষা শৈশবকাল অতিক্রম করেছিল। উদ্ভবকালের এই সংকট উত্তরণ তো দূরের কথা, মুসলিম আমলে বাংলা ভাষা নতুন করে সংকটে পড়ে যায়। এই আমলের প্রথম দুশো বছর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতা প্রায় শূন্যই ছিল।

চর্যাপদ

আট থেকে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছর বাংলা ভাষা কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় নি। জন্মকালের এরূপ বৈরী পরিবেশ ও ভগ্নাবস্থায় একটি জাতির ভাষা মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে থাকার কথা। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তা হয় নি। বরং জনজাতির জীবনরস ও প্রাণশক্তি আহরণ করে বাংলা ভাষা টিকেছিল এবং সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের মতো একটি বৌদ্ধিকশ্রেণির সেবা পেয়ে সীমিত আকারে হলেও শৈশবেই জ্বলে উঠেছিল। একটি মাত্র সংকলনগ্রন্থ *চর্যাপদ* সেই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, যা প্রত্নবাংলার শক্তি-সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে আছে। ২৩ জন পদকর্তার ৫১টি চর্যার সংকলনের অর্থ এই নয় যে, ২৩ জন ছাড়া আর কোনো কবি ছিলেন না, আর ৫১টি পদ ছাড়া অন্য কোনো পদ রচিত হয় নি। আঠারো শতকে বৈষ্ণবপদাবলির সংকলনগ্রন্থে কোনো কোনো কবির দু-চারটি পদ স্থান পেয়েছে, কিন্তু পরে নানা সূত্র থেকে জানা গেছে যে, তাঁরা বহু সংখ্যক বৈষ্ণবপদ রচনা করেন; কেউ কেউ শতাধিক পদের রচয়িতা ছিলেন।

চর্যাপদ গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত। পদশীর্ষে রাগের নাম ও জোড় চরণান্তে 'ধ্রু' শব্দের উল্লেখ থেকে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। অধিকাংশ পদ ১০ চরণে সমাপ্ত, তবে এর কমবেশি চরণের পদও রয়েছে। পদান্তে, কোথাও কোথাও পদমধ্যে, 'ভনিতা' তথা কবির নামযুক্ত চরণ রয়েছে। পদগুলি প্রধানত ধ্বনিপ্রধান পয়ার ছন্দে রচিত; চরণের মাত্রা-সংখ্যা ১৬; তবে ১৮, ২৬ মাত্রার চরণও রয়েছে। জোড়চরণে অন্ত্যমিল রয়েছে। চর্যার বিষয়বস্তু ধর্মীয় গুহ্যতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালি হওয়ায় প্রকাশের ভাষা হয়েছে অতিমাত্রায় প্রতীক-রূপক-সংকেতধর্মী। এগুলি চর্যাপদের বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য।

এখন প্রশ্ন হলো, এসব উপাদান সমন্বয়ে রচিত কবিতার ফর্ম বা গঠনশৈলী কবিরা পেলেন কোথায়? চর্যাপদকারদের সামনে দুই-চার চরণে রচিত সংস্কৃত শ্লোক বা আর্যা এবং চার-ছয় চরণে রচিত অপভ্রংশের দোহাকোষ ছিল। তবে এগুলি গীত হওয়ার জন্য রচিত হয় নি। এগুলিতে ভনিতা ছিল না; ভাষাও ছিল হেঁয়ালিমুক্ত। অর্থাৎ কবিদের সামনে গঠনশৈলী ও ভাষাগত কোনো মডেল বা আদর্শ ছিল না; এর সবকিছুই তাঁদের নির্মাণ করতে হয়েছে। চর্যাপদের আঙ্গিককাঠামো যেমন পরিশীলিত, এর ভাষারীতিও তেমনি পরিকল্পিত; এতে তত্ত্বকথা ও শিল্পকথা একত্রে মিশেছে।

চর্যাপদের ভাষার ভিত্তি আধ্যাত্মিক চেতনা। এজন্য এ ভাষা জীবন থেকে আসে নি, পদকার সিদ্ধাচার্যদের সাধনালব্ধ সুগভীর অনুভূতি ও অতি সূক্ষ্ম উপলব্ধি থেকে এ ভাষার জন্ম হয়েছে। 'দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই।' (কচ্ছপী দোহন করে ভাঁড়ে ধরা যায় না।), 'রুখের তেন্তলি কুম্বীরে খাই।' (গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়।), 'সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।' (শ্বশুর নিদ্রা গেল, বধূ জেগে থাকে।), 'কমল কুলিশ ঘাণ্টে করহু বিআলী।' (কমল ও বজ্রের দ্বারা বিকালের ভোজন কর।), 'বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে।' (বলদ প্রসব করল, গাভী রইল বন্ধ্যা।) ইত্যাদি চরণগুলির ভাষা তত্ত্বের ভাষা; রূপক-সংকেতের আড়ালে সে তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। রূপক-সংকেতের ভেদ ভেঙে সে তত্ত্বের মর্মোদ্ধার করতে হয়। রূপক-সংকেতের রহস্যভেদ করতে হলে সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রের আশ্রয় নিতে হয়।

চর্যাপদের চরণে চরণে ধর্মীয় পরিভাষার এরূপ রহস্যাবরণ থাকায় এর ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'সান্ধ ভাষা' বলা হয়। নবম থেকে একাদশ শতাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে চর্যাকারগণ দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম এ ভাষা গড়ে তোলেন। তাঁরা প্রায় সবাই সাধনসিদ্ধ, সংসারবিবাগী এবং বৌদ্ধমঠ-মণ্ডলবাসী ছিলেন। তাঁরা এক মঠ-মণ্ডল থেকে অপর মঠ-মণ্ডলে বিচরণ করতেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-ভাষার বিনিময় করতেন। উপরন্তু গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধরে তাঁরা নানা স্থানে যাতায়াত করতেন; এতেও তাঁদের মধ্যে ভাব-ভাষার বিনিময় হত। তাঁদের এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সাধনতত্ত্ব, সাধনরীতি প্রকৃতপক্ষে চর্যাপদের অবয়ব ও ভাষা গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। আর এর সঙ্গে গোষ্ঠীচেতনা যুক্ত হয়ে চর্যার নির্মাণরীতিকে গ্রহণযোগ্য স্থায়িত্ব দান করেছে।

চর্যাপদের রূপক-প্রতীক-সংকেত-উপমার ভাষা সিদ্ধাচার্যদের অধ্যাত্মতত্ত্বের উপযুক্ত বাহন ছিল। আধ্যাত্মিক ধর্মজাত এ ভাষা দ্বারা অন্যকিছু রচনা করা সম্ভব ছিল না। অন্য ধর্মমতের কেউ এ ভাষা রপ্ত করতে পারেন নি। চৌদ্দ শতকের কবি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি মধ্যযুগে অনেকে, এমন কি উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রপ্ত করেছিলেন। চর্যার সন্ধ্যা ভাষা ছিল সহজিয়া মত-পথের বহির্ভূত অন্যজনের আয়ত্তের অতীত।

তবে চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে এটাই শেষ কথা নয়। চর্যাপদকারগণ সাধক, আবার শিল্পীও বটে। তাঁরা যে রূপক-প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার অনেকাংশই সমকালের জীবন ও প্রকৃতি থেকেই গৃহীত হয়েছে। মানবজীবন ও প্রকৃতিলোককে স্পর্শ করে, এমন বহু চরণ চর্যাপদে রয়েছে : 'তো মুহ চুম্বী কমল রস পিবমী।' (তোর মুখ চুম্বন করে কমলরস পান করি।), 'ভব নই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' (ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বহে।), 'তরঙ্গেতে হরিণার খুর ন দীসই।' (দ্রুত দৌড়ের ফলে হরিণের ক্ষুর দেখা যায় না।), 'কানু বিলসই আসব মাতা।' (আসবমত্ত কানু বিলাস করে।), 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মই সাঙ্গ।' (ওলো ডোম্বী, তোকে আমি সাঙ্গা করব।) ইত্যাদি। তত্ত্বের আড়ালেও এরূপ ভাষা জীবনের কথা বলে। অর্থাৎ চর্যাপদ তত্ত্ব ও জীবনকে একসূত্রে বেঁধেছে, যা পদকর্তাদের পরিকল্পিত শিল্পিত ভাষার কারণেই সম্ভব হয়েছে। এখানে কবিদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়, মনন ও আবেগের একটা মেলবন্ধন রচিত হয়েছে। চর্যাপদের ভাষা সরাসরি জীবন থেকে আসে নি, সাধক কবিদের অধ্যাত্মরসে জারিত হয়ে কাব্যিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা প্রধানত দ্ব্যর্থবোধক — বাগার্থ, বাচ্যার্থ বা বাহ্যার্থ এবং ব্যঞ্জনার্থ, ব্যঙ্গার্থ বা গূঢ়ার্থ। পদের এক অর্থ গেছে অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দিকে, অপর অর্থ গেছে বহিস্থ চিত্র বা দৃশ্যের দিকে। লুইপার ১ নং পদের প্রথম শ্লোক "কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।" এর বাগার্থ বা বাচ্যার্থ — মানবদেহ বৃক্ষের মতো; দেহে বৃক্ষশাখার মতো পঞ্চেন্দ্রিয় আছে। চিত্ত চঞ্চল হলে তাতে কাল প্রবেশ করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশ হলে মানুষের পতন ঘটে। ব্যঞ্জনার্থ বা গূঢ়ার্থ — বৃক্ষতুল্য মানবদেহে পাঁচটি স্কন্ধ (রূপ, বেদন, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) আছে, যা জগতের প্রতি মোহ ও আসক্তি সঞ্চার করে। এর ফলে চিত্ত চঞ্চল হয় ও কাল বা ধ্বংস ডেকে আনে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

'কাল'কে agent of destruction বা ধ্বংসের দূত বলেছেন; প্রাচীন টীকাকারদের মতে, কাল হলো 'চন্দ্রের রাহু', যা ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করে। এরূপ ধ্বংস বা মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? কবি দ্বিতীয় শ্লোকে বলেন, "দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পছিঅ জাণ॥" — মহাসুখকে দৃঢ়ভাবে ধর; আর গুরুকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি এর উপায় বলে দেবেন। এখানে কোনো রূপক নেই। মহাসুখ হলো সহজানন্দ বা নির্বাণ। ৩ নং পদের শুঁড়িনি, ৪নং পদে যোগিনি, ৮ নং পদে কামলি, ১০ নং পদে ডোমনি, ১৪ নং পদে চণ্ডালি, ২৮ নং পদে শবরী ইত্যাদি লৌকিক অর্থে বিভিন্ন জাত-পেশার নারী, কিন্তু গূঢ়ার্থে তারা নৈরাত্ম্যদেবী বা শূন্যসত্তা। ১৩ নং পদে কাহ্নপা শূন্যকে 'সূণ মেহেরী' (শূন্য-মহিলা) এবং ২৮ নং পদে শবরপা সহজকে 'সহজ সুন্দরী' বলেই উল্লেখ করেছেন।

চর্যাপদে আরেক ধরনের ভাষা আছে, যা পুরোপুরি ধাঁধা বা হেঁয়ালির ভাষা। রূপক-সংকেতের অন্তর্নিহিত অর্থটি না বুঝলে হেঁয়ালির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না। বিশেষজ্ঞগণ এরূপ ভাষাকে 'সন্ধা ভাষা' বলেছেন। সন্ধা ভাষা সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেন, "যে ভাষায় বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম+ধৈ) অথবা যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম+ধা) তাহাই সন্ধা ভাষা।" কুক্কুরীপার ২ নং পদটি প্রায় পুরোটাই প্রহেলিকাচ্ছন্ন :

দুলি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলি কুম্হীরে খাই॥...
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই। কানেট চোরে নিল কা গই মাগই॥
দিবসহি বহুড়ী কাবুহি ডর ভাই। রাতি ভইলে কামরু জাই॥
অইসনী চর্যা কুক্কুরীপাএ গাইল। কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইল॥

অর্থ — কচ্ছপ দোহন করে ভাঁড়ে ধরা যায় না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়।... শ্বশুর নিদ্রা গেল, বধূ জেগে থাকে। দিনের বেলায় যে বধূ কাক দেখে ভয় পায়, রাত হলে সে কামরূপ যায়। কবি জানেন যে, এ ভাষা সহজবোধ্য নয়। তাই ভনিতায় তাঁর মন্তব্যঃ এহেন চর্যা কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে প্রবেশ করে অর্থাৎ কোটিতে একজন বোঝে। অনুরূপ চরণ ঢেণ্ঢণপার ৩৩ নং পদেও রয়েছে। —

বেঙ্গসঁ সাপ চঢ়িল জাই। দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাই॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে। পীঢ়া দুহিঅই এ তীনি সাঝে॥
জো সো বুধী সোহি নিবুধী। জো সো চোরা সোহি সাধী॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই। ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝই॥

অর্থ — ব্যাঙ দ্বারা সাপ আক্রান্ত হয়। দোহা দুধ আর বাঁটে ফিরে না। বলদ প্রসব করল, আর গাভী হলো বাঁঝা। দিনে তিনবার পাত্রে দোহা হয়। যে বুদ্ধিমান, সেই নির্বোধ। যে চোর, সেই সাধু। নিত্যই শৃগাল সিংহের সাথে যুদ্ধ করে। ভনিতায় কবির মন্তব্য : ঢেণ্ঢণপার গীত অল্প লোকেই বোঝে।

চর্যাপদের ভাষার অপর মাত্রা হলো, এর তাত্ত্বিক পরিভাষা। পরিভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝলে পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। পরিভাষাগুলি এসেছে মূলত বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে, যার কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। এরূপ ভাষা যথার্থ অর্থেই

'আলো-আঁধারি'র ভাষা। এগুলি অধিকাংশই অধ্যাত্মতত্ত্ব ও যোগসাধনার সাথে সম্পৃক্ত। চর্যাপদে ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দ ও পরিভাষার বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

পারিভাষিক শব্দ	**অর্থ**
অবধূতী	দেহের মেরুদণ্ড-সংলগ্ন সুষুম্না নাড়ি, এর অপর নাম সরস্বতী বা মহাসুখাধার। এর বাম পাশে ইড়া ও ডান পাশে পিঙ্গলা নাড়ি রয়েছে।
আলি-কালি	ইড়া-পিঙ্গলা, শ্বাসগ্রহণ বা ধমন এবং শ্বাসত্যাগ বা চমন; আলি-কালি, কমল-কুলিশ, চন্দ্র-সূর্য অভিন্ন অর্থ বহন করে।
এবংকার	দ্বৈতবোধ;
ওড়িয়ান (<উড্ডিয়ান)	মস্তকে সহস্রার মহাসুখচক্র;
কমল-কুলিশ	কমল অর্থ—মস্তিষ্ক, কুলিশ অর্থ—শূন্য;
করণ	ইন্দ্রিয়সমূহ;
করুণা	শূন্য ও করুণার সমরস হলে সহজাবস্থা প্রাপ্ত হয়।
কান্ধ	দেহ; রূপ, বেদন, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমবায়ে মানবদেহ গঠিত।
কাপুর (<কর্পূর)	শূক্র;
কাল	ধ্বংসবীজ;
খ-সম	আক্ষরিক অর্থ—আকাশতুল্য, পারিভাষিক অর্থ—শূন্যতা;
গগন	মস্তকের দশমদ্বার, ব্রহ্মরন্ধ্র;
গজবর	আক্ষরিক অর্থ— শ্রেষ্ঠ হাতি, পারিভাষিক অর্থ—শোধিত চিত্ত;
গঙ্গা	ইড়া, অনুরূপ যমুনা—পিঙ্গলা, সরস্বতী—সুষুম্না বা অবধূতী;
চণ্ডালী	আক্ষরিক অর্থ—চণ্ডালরমণী, পারিভাষিক অর্থ—তেজঃস্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী যোগিনি।
চমন (তন্ত্রের পরিভাষা)	শ্বাসত্যাগ, পিঙ্গলা নাড়ি, পূরক;
চন্দ্র (তন্ত্রের পরিভাষা)	মেরুদণ্ডের তিন নাড়ির মধ্যে বাম নাসিকাপুটে অমৃতধারাবাহী ইড়া নামক নাড়ি রয়েছে, যার দ্বারা শ্বাসগ্রহণ করা হয়। এর অপর নাম চন্দ্র, গঙ্গা, ললনা, প্রজ্ঞা (আদর্শ জ্ঞান) ইত্যাদি। এর বিপরীতে আছে সূর্য: ডান নাসিকাপুটে বিষধারাবাহী পিঙ্গলা নাড়ি, যার দ্বারা শ্বাসত্যাগ করা হয়। এর অপর অর্থ—অদ্বয় বা সমতাজ্ঞান।
চৌষট্টি কোঠা (দাবাখেলার ছক)	নির্মাণচক্র; এখানে চৌষট্টি হলো আধ্যাত্মিক সংখ্যা।
জিনপুর	মহাসুখপুর।
ডোম্বী	আক্ষরিক অর্থ—ডোমনারী, পারিভাষিক অর্থ—বায়ুস্কন্ধের অধিদেবতা যোগিনি।
তথতা	প্রজ্ঞাপারমিতাবস্থা;
ত্রিধাতু	কায়, বাক্ ও চিত্ত;
ত্রিশরণ	বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিন শরণস্থান; ত্রিধাতু ও ত্রিশরণ অভিন্ন পরিভাষা।

দশবলরত্ন	বুদ্ধরত্ন, জিনরত্ন, তথতারত্ন, চতুর্থানন্দ; এসবই শূন্যের প্রতীক বা বিকল্প শব্দ।
ধমণ (তন্ত্রের পরিভাষা)	শ্বাসগ্রহণ, রেচক;
নাদ	শব্দ, ধ্বনি;
নির্বাণ	পরম মুক্তি;
নৈরামণি	নৈরাত্ম্যাদেবী, বিজ্ঞানস্কন্ধের অধিদেবতা; শূন্যকে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ২৮ নং পদে 'সূণ-নৈরামণি' এবং ১৩ নং পদে 'সূণ-মেহেরী'র উল্লেখ আছে।
নৌকা	মহাসুখকায়;
পঞ্চজন	আক্ষরিক অর্থ—পাঁচ জন, পারিভাষিক অর্থ—পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক)।
বজ্র	শূন্য;
বিন্দুনাদ (বিন্দু ও নাদ)	করুণা-শূন্য, কুলিশ-কমল, বোধিচিত্ত-খসম, গ্রাহকজ্ঞানবিকল্প ও প্রজ্ঞাজ্ঞানবিকল্প; নাথপন্থে বিন্দু হলো শুক্র, আর নাদ হলো সহস্রার কমল যেখানে অনাহত ধ্বনি বাজে। ব্রাহ্মণ্যমতে নাদবিন্দুর অর্থ চন্দ্রবিন্দু [ঁ] বা ওঁ-কার চিহ্ন।
বোধি	চরম জ্ঞান;
ভব-নির্বাণ (ভব ও নির্বাণ)	ভববন্ধন ও চরমমুক্তি;
ভাবাভাব (<ভাব+অভাব)	অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব;
মণিমূল (<মণিপুর)	ষট্চক্রের দ্বিতীয় চক্র নাভিতে অবস্থিত।
মন-রত্ন	শুদ্ধচিত্ত, বোধিচিত্ত;
মহামুদ্রা	যোগসাধনার একটি জটিল মুদ্রাবিশেষ;
মহাসুখ	পরমানন্দ; নির্বাণপ্রাপ্তিতে এরূপ আনন্দ অনুভূত হয়।
মার	মৃত্যু ও প্রলোভনের দেবতা;
মুষিক	চিত্তপবন;
রবিশশী (তন্ত্রের পরিভাষা)	ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ি; প্রজ্ঞা ও উপায়;
শবর	আক্ষরিক অর্থ—শিকারজীবী, পারিভাষিক অর্থ—হেরুক বা বজ্রধর (ভগবান)।
শবরী	আক্ষরিক অর্থ—শবররমণী, পারিভাষিক অর্থ—নৈরাত্ম্যদেবী, জ্ঞানমুদ্রা (ভগবতী)।
শশধর	বোধিচিত্ত, শুক্র।
শূন্য/ শূন্যতা	বজ্র, নৈরাত্মা; বৌদ্ধরা 'আত্মা' (soul) বিশ্বাস করে না, তাই নৈরাত্মাদেবীর কল্পনা। সহজসিদ্ধার নৈরাত্মা (non-soul) বা শূন্য, তান্ত্রিকের কুলকুণ্ডলিনীর সমতুল্য। কুণ্ডলিনী বৃত্ত বা গোলাকার অর্থে শূন্যকেই বোঝায়। শূন্য নারীসত্তা; শূন্যকে ২৮ নং পদে 'সহজ-সুন্দরী, ১৩ নং পদে 'শূন্য-মহিলা' বলা হয়েছে। সহজিয়ামতে সহজ, শূন্য, নৈরাত্মা সমার্থক শব্দ।
স্ব-সংবেদন	নির্বিকল্প মহাসুখ;

সমরস	সহজাবস্থা, শূন্যতা ও করুণার অভেদ মিলন।
সহজ/সহজানন্দ	সহজিয়া মতে, আনন্দ চার প্রকার : প্রথমানন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। সহজসিদ্ধার পরমপ্রাপ্তি নির্বাণ বা সহজানন্দ।
সূর্য	অদ্বয় বা সমতাজ্ঞান
সোনা-রূপা	সোনা শূন্যের এবং রূপা ভাব বা বস্তুর প্রতীক।
হরিণ	জ্ঞানমুদ্রা
হেরুক	বৌদ্ধতন্ত্রে প্রধান উপাস্য, বজ্রধর, করুণা, বিন্দু, বোধিচিত্ত।[৫]

বস্তুত এসব পরিভাষা হলো চর্যাপদের দুর্জ্ঞেয় বাণীমন্দিরে প্রবেশের চাবিকাঠি। এরূপ পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হলে প্রহেলিকায় রহস্যাবৃত চর্যার অর্থবোধ ও রসোপলব্ধি সম্ভব হয়।

চর্যাপদের মূলধারা এগারো শতকে শেষ হয়ে যায়, যদিও পূর্বৈতিহ্য ধরে 'চা-চা গীতি' নামে নবপর্যায়ের চর্যাপদ পনেরো শতক পর্যন্ত টিকেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরানো শেকড়কে আঁকড়ে ধরে থেকে এ ধারা একটি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শেষে পুথিবদ্ধ হয়ে পড়ে। এখন সাহিত্যের ভাষারূপেই চর্যাপদের ভাষার মুখ্য পরিচয়। জনগণের ভাষা জনগণের জীবনরস পান করেই বেঁচে থাকে, পরিপুষ্টি ও বিকাশলাভ করে। চৌদ্দ শতকে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* বাংলা ভাষার বিবর্তিত সে রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

এগারো থেকে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত চারশো বছরের মধ্যে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতার দুবার পালাবদল হয়, সেকথা আমরা পূর্বে বলেছি। এ সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন না থাকায় বাংলা ভাষার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তা বলার সুযোগ নেই। চণ্ডীদাস গীতিকবি। গীতিকবিতায় কবির অন্তরঙ্গ আবেগ অন্তরঙ্গ ভাষায় প্রকাশ পায়, কিন্তু মধ্যযুগে কবিদের ক্ষেত্রে তার সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। চণ্ডীদাসের কাব্যভাষা কবির নিজস্ব হলেও ভাব ছিল পরোক্ষ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ির উক্তি-প্রত্যুক্তি তথা সংলাপের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে, আবার ঘটনার বর্ণনাও আছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নাটক নয়, নাটগীতি। সুতরাং সংলাপের ভাষা চরিত্রানুগ হয় নি; ঘটনা বর্ণনার অনুরূপ সংলাপের ভাষাও কবির নিজস্ব ভাষা।

বড়ু চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যভাষার ভিত্তি ছিল গ্রামের লোকজীবন ও লোকসমাজ। সাধারণ আসরে গান গেয়ে তা পরিবেশন করা হত; গ্রামের মানুষ তাঁর গানের সমঝদার ছিল। সহজবোধ্য ও জীবনবাদী ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যভাষার মূল কাঠামো। সমাজের নারী-পুরুষের মধ্যে প্রচলিত শব্দ, উপমা, প্রবাদ, এমন কি, বাক্‌ভঙ্গির মিশ্রণ রয়েছে এ ভাষায়। সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও চণ্ডীদাস সংস্কৃতবহুল কাব্যভাষা নির্মাণের চেষ্টা করেন নি। বরং ব্যতিক্রম ছাড়া লোকভাষাকে মান্য করে চার

শতাধিক গীতিপদ-সংবলিত বৃহৎ এই কাব্যখানি রচনা করেন। পদশীর্ষে রাগ, পদান্তে ভনিতা, জোড়-চরণে অন্ত্যমিল, অক্ষরবৃত্তের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে গীতিপদগুলি রচিত। চর্যাপদ সম্পর্কে কবি অবহিত ছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই, তবে জয়দেবের গীতিকাব্য *গীতগোবিন্দম্* সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। সুতরাং পদের রূপরীতি ও গঠনশৈলীর কতক বিষয় তিনি পূর্বসূরির কাছ থেকে পেয়ে থাকতে পারেন। কোনো কোনো বিষয়ে প্রচলিত 'ধামালি', 'ঝুমুর' প্রভৃতি লোকগীতির প্রভাবও থাকতে পারে। কবির বর্ণনা ও চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি সংবলিত 'তাম্বুল খণ্ডে'র একটি পদের অংশবিশেষ :

(বর্ণনা) কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বুল দিআঁ রাধাক
বিমুখ বদনে হাসো॥ ল বড়ায়ি॥
(রাধা) কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহলী আওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর॥
(বড়ায়ি) আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।
বিরহ জরেঁ তেঁহে জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ॥
(বর্ণনা) এ বোল শুনিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥...
(রাধা) ঘরের সামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥
(বড়ায়ি) যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥
(রাধা) ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতী॥

উদ্ধৃতির বন্ধনী অংশ মৎকৃত। চণ্ডীদাসের এ ভাষা বিশ্লেষণ করলে কতক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে :

ক. কবির ভাষা সম্পূর্ণ রূপক-সংকেতবর্জিত; পদের অর্থ বাচ্যার্থনির্ভর। চর্যাপদের ভাষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ রূপক-সংকেতাশ্রিত ও ব্যঞ্জনানির্ভর।
খ. ভাষা অকৃত্রিম ও জীবনঘনিষ্ঠ। চর্যাপদের ভাষা ছিল কৃত্রিম ও জীবনবিচ্ছিন্ন।
গ. উক্তিগুলি নাট্যরসে পরিপূর্ণ। কোনো কোনো উক্তি এমন জীবন্ত যে, যেন তাতে চরিত্রের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।
ঘ. কর্পূর, তাম্বুল, সর্বাঙ্গ, সুন্দর, সুলক্ষণ, স্মরণ, স্থিতি প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর তৎসম শব্দের পাশাপাশি কপুর (<কর্পূর), নেত (রেশমবস্ত্র), পাটোল (<পট্টবস্ত্র), আবথা (<অবস্থা), বেথাঁ (<ব্যথা), বোল, রাখোআল (<রক্ষাপাল), দেহা (<দেহ), নেহা (<স্নেহ), মুকতী (<মুক্তি), ধিক, দহেঁ (<হ্রদ) প্রভৃতি তদ্ভব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যতিক্রম ছাড়া *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* ৪১৮টি পদ এরূপ ভাষায় রচিত হয়েছে। লঘু-গুরু শব্দের এরূপ মিশ্রণ শ্রুতিকটু মনে হলেও কবি অবলীলাক্রমে তা প্রয়োগ করেছেন। চণ্ডীদাসের লক্ষ্য ছিল মানবিক আবেগ সৃষ্টি। "বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানি। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভরের পণি॥", "পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ। মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥", "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে। কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥" ইত্যাদি চরণের ভাষা আটপৌরে, কিন্তু হৃদয়গ্রাহী। চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণব পদাবলির ভাষা নানা মাত্রিকতায় পরিবর্তিত হয়েছে, অধিক মার্জিত, শিল্পিত ও দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠেছে। —

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥

বড়ু চণ্ডীদাসের প্রায় একশ বছর পরে রচিত জ্ঞানদাসের এই পদেও যুক্তাক্ষর নেই, অপরিচিত শব্দ নেই; তবু এ ভাষা উন্নতভাবের বাহন হয়েছে। এ ভাষার উৎস বহির্জীবন নয়, কবিহৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে তা উঠে এসেছে। এখানে কবির ভাষাগুণে মানবপ্রেম ও অধ্যাত্মপ্রেম এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যভাষার ভিন্ন রূপও রয়েছে। তিনি সংস্কৃতবহুল ভাষাপ্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। তিনি রাধার রূপ বর্ণনা করেছেন এভাবে :

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা। বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥...
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা। কুণ্ডল মণ্ডিত চারু শ্রবণ যুগলা॥

উদ্ধৃতিতে বেকত (<ব্যক্ত) ও বিজুলি (<বিদ্যুৎ) ছাড়া বাকি সব শব্দ তৎসম। তাঁর কবিত্বশক্তির ও শব্দসম্ভারের অভাব ছিল না; তিনি অনায়াসে এরূপ সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতি বাংলায় কাব্যরচনা করতে পারতেন। চণ্ডীদাসের এরূপ পদোবন্ধ সতেরো শতকের কবি আলাওলের এবং আঠোরো শতকের কবি ভারতচন্দ্রের পদোবন্ধের সমকক্ষ ছিল। কিন্তু এরূপ ভাষারীতি বা বাক্‌প্রতিম কবির অভিপ্রেত ছিল না। প্রাকৃতজনের বোধগম্য করে তোলার জন্য তিনি মুখের বুলিকে প্রধান উৎসরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এটি তাঁর

ভাষাচেতনারই ফল বলে প্রতীয়মান হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার মূলরূপটি পরবর্তীকালে কেউ অনুসরণ করেন নি। তিনিই এ ধারার প্রথম ও শেষ রচয়িতা।

পনেরো শতকের শেষভাগে ও পুরো ষোলো শতকে বাংলা সাহিত্যে জোয়ার আসে; অন্য কথায় বলা যায়, বিস্ফোরণ ঘটে। এর কারণ হিসাবে আমরা শাসকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার ও চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলনের কথা বলছি। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য ও ভাষা পদাবলি ও নাটগীতির আবেষ্টনী ভেদ করে পদাবলিসহ মঙ্গলকাব্য, প্রণয়োপাখ্যান, অনূদিত মহাকাব্য ও পুরাণ, চরিতকাব্য, শাস্ত্রকাব্য ইত্যাদি বিষয় ও আঙ্গিকে বিস্তার লাভ করে শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্পে বিশাল আকার ধারণ করেছে। বাংলা ভাষা এসব বিচিত্র বিষয় ধারণ করার মতো ক্ষমতাও অর্জন করেছে। অর্থাৎ বিষয় অনুযায়ী ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগের হিন্দু কবির সঙ্গে মুসলিম কবি যুক্ত হয়েছেন। এ ধারার কাব্যভাষা সৃষ্টিতে তাঁরাই যৌথভাবে কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। এসব ধারার কাব্যরচনা সতেরো ও আঠারো শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এ যুগের বাংলা সাহিত্যের অতি উন্নত ও সমৃদ্ধ পদাবলি ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ধারা বা শাখা হলো : ক. মঙ্গলকাব্য, খ. প্রণয়োপাখ্যান, গ. সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, ঘ. চৈতন্য ও তাঁর অনুচরবৃন্দের জীবনীকাব্য, ঙ. ধর্ম ও জ্ঞানবিষয়ক বিবিধ শাস্ত্রকাব্য ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্য ও প্রণয়কাব্য আখ্যানধর্মী পাঁচালিকাব্যের ভাষা ছিল মূলত বর্ণনামূলক। মহাকাব্য, পুরাণ ও শাস্ত্রকাব্যগুলি বর্ণনামূলক হলেও কবিদের অনুবাদের উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি করতে হয়েছে। বিভিন্ন পদাবলির ভাষা ছিল মূলত আবেগাশ্রিত ও ব্যঞ্জনাধর্মী। বৈষ্ণব পদাবলির মতো অধ্যাত্মমূলক গীতিকবিতার ভাষা ছিল দ্ব্যর্থবোধক; এর এক অর্থ ছিল ঊর্ধ্বমুখী ধর্মরসসিদ্ধ, অপর অর্থ ছিল মর্ত্যমুখী মানবরসসিক্ত। চরিতকাব্যগুলি ছিল মৌলিক ও বাস্তব জীবনাশ্রিত; এগুলির ভাষা প্রধানত বিবৃতিধর্মী হলেও তা ছিল কল্পনাবর্জিত ও বাচ্যার্থনির্ভর। *চর্যাপদ* মঠ-মন্দিরে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* গ্রামীণ পরিবেশে রচিত হয়েছে। কোনো কোনো কবি রাজা-মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং নগরসংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হন। অর্থাৎ এ যুগেও বাংলা ভাষা নাগরিক চেতনা ও বৈদগ্ধ্যের স্পর্শে আলোকিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে। কাজী দৌলত, আলাওল ও ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষায় দরবারের ছায়াপাত ঘটেছে।

মঙ্গলকাব্য

প্রথমে মঙ্গলকাব্যশাখার কথা বলতে হয়। মঙ্গলকাব্যের মুখ্যধারা চারটি — মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্য। শিবায়ন, দুর্গা/গৌরীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি নামেও কাব্য লেখা হয়েছে। এসব ধারার কবির সংখ্যা শত শত। আখ্যানমূলক কাব্যগুলিতে আপন আপন দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন ও পূজাপ্রচার করা হয়েছে। আখ্যানগুলির উৎস কোনোটির পুরাণ, কোনোটির লোককাহিনি, কোনোটির আধা ইতিহাস আধা কবিকল্পনা। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্য পূজোপলক্ষে গান ও আবৃত্তিযোগে পরিবেশন করা হত। শ্রোতারা ছিল চারপাশের আপামর জনসাধারণ। *পদ্মাপুরাণ* (১৪৯৪)

শীর্ষক মনসামঙ্গলের কবি ছিলেন বরিশালের ফুলশ্রী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত। *মনসাবিজয়ের* (১৪৯৫) কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ছিলেন চব্বিশ পরগনার বাদুড্যা গ্রামের কবি। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম বর্ধমানের দামিন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে মেদিনীপুরের এক জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় আশ্রয় পান এবং সেখানে বসেই কাব্যরচনা করেন। অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল, কিন্তু তাঁরা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ভিন্ন ছিলেন। গ্রাম-নগর, পরিবার-শিক্ষা ভেদে তাঁদের অভিজ্ঞতা পৃথক ছিল। এজন্য তাঁদের কাব্যের রূপ-রস-ভাষাও ভিন্ন ছিল। নগরচেতনার প্রভাব কেবল ভারতচন্দ্রের ভাষায় প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্যদের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। মুকুন্দরামের গ্রাম-নগরের মিশ্র অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গ্রামীণ ভাব-ভাষা-পরিবেশের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যের ভাষার মূল ভিত্তি গ্রামীণ জীবন ও সমাজ।

বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণের* ভাষা সম্পর্কে জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত বলেন, "আদর্শ পুথিতে আমরা দেখিতে পাই, ইহার ভাষা সংস্কৃত-শব্দ বহুল প্রয়োগের ভারে কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নাই। আভিধানিক দুরূহ শব্দসম্ভারে ইহার রচনা কোথাও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে নাই। সর্বত্রই দেশজ বা স্থানীয় কথ্যভাষা প্রয়োগে উহা অত্যন্ত সরল এবং অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সকলের নিকটেই সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। কবির পিতৃভূমি ফুল্লশ্রী গ্রামের কথ্যভাষার রূপ ও শব্দোচ্চারণের স্থানীয় ভঙ্গি বা রীতি যথাযথভাবে রচনার ভেতরে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[৬]

পদ্মাপুরাণের কোনো কোনো শব্দরূপে আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রভাব থাকলেও বাক্যের মূল চাল ছিল সাধুরীতির।

শুনিয়া কোতোয়ালের কথা সাধুর নন্দন।
পোষাক করিয়া চলে ভেটিলে কারণ॥
আপনে পরিচয় দিয়া করিলা বিবরণ।
আরম্ভ করিয়া সাধু চলিল তখন॥

উক্তির সকল ক্রিয়াপদ সাধুরীতির; ফারসি 'কোতোয়াল' ও হিন্দি 'ভেট' ছাড়া সকল পদ তৎসম। তবে দুর্বোধ্য, দুরুচ্চার্য শব্দ নেই। কবির প্রকাশভঙ্গি সরল ও সাবলীল। সংলাপের ভাষা আরও সরল ও জীবনঘনিষ্ঠ। রূপের বর্ণনায় কবির ভাষা হয়েছে লালিত্যপূর্ণ ও দীপ্তিময়।

চাচর চিকুর শোভে তিলক ললাটে। পূর্ণিমার চন্দ্র জেন মেঘের নিকটে॥
দর্শনে মুকুতাপতি অধরে তাম্বুল। নাসিকার শোভা জেন জিনি তিল ফুল॥

অংশটি পোষাকি ভাষায় রচিত। পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনি হওয়ায় মঙ্গলকাব্যগুলি আকারে বৃহৎ হয়। কাব্যগুলিতে দেবচরিত্র, প্রধান ও অপ্রধান মানবচরিত্র, মূলকাহিনি, উপকাহিনি, সমাজচিত্র, প্রকৃতি-পরিবেশ ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা রয়েছে। সে কারণে ভাষার রূপপ্রকৃতি সর্বত্র অভিন্ন থাকে না।

মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গলের* (ষোলো শতকের নব্বই দশক) দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর রূপকে কৃষক-পরিবারের, আখেটিখণ্ডে ব্যাধ-পরিবারের ও বণিকখণ্ডে সদাগর-পরিবারের জীবনকাহিনি রয়েছে। মুকুন্দরামের ভাষার মূল চালটি গ্রামীণ। বিশেষত কালকেতু-ফুল্লরার ব্যাধজীবনের চিত্রাঙ্কনে উচ্চমার্গীয় ভাষা ব্যবহারের সুযোগ ছিল না, করলে সুষ্ঠু ও শিষ্ট প্রয়োগ হত না, দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু হত। কালকেতু-ফুল্লরার দারিদ্র্যকবলিত সংসারজীবনের একটি চিত্র নিম্নরূপ :

(কালকেতু) আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা
সেআড়ি লইয়া ভেট জাহ তুমি তথা।
খুদ কিছু ধার নিহ সয়্যের ভবনে
কাঁচড়া খুদের কাঁজি রান্ধিবে জতনে।...
(বর্ণনা) সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেল সইয়ের দুয়ার
সেআড়ি ভেট দিয়া সয়ে কৈল নমস্কার।
আইস আইস বলিয়া ডাকেন তাঁরে সই
দেখিতে লাগয়ে সাদ এতদিন বই।
(ফুল্লরা) বিধাতা করিল মোরে দারিদ্রের কান্তা
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।...
(বর্ণনা) আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি
চাপিয়া বসিল দোঁহে চৌখণ্ডি পিঁড়ি।
ফুল্লরা দুকাঠা চালু মাগিল উধার।
কালি দিহ বল্যা সই কৈল অঙ্গিকার॥
(সই) আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি।
মোর সাথে গোটা কথো দেখহ উকিনি॥

বন্ধনীর অংশ মৎকৃত। কবির ভাষা পল্লির সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার খুব কাছাকাছি চলে গেছে। অনাড়ম্বর জীবনের ছবি কবি অনাভরণ ভাষায় চিত্রিত করেছেন। ব্যাধ-পরিবারের সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করেই তিনি শব্দনির্বাচন করেছেন। 'সেআড়ি লইয়া ভেট', 'কাঁচড়া খুদের কাঁজি', 'দুকাঠা চালু মাগিল উধার', 'আইসহ প্রাণের সই, বৈস গো বহিনি', 'গোটা কথো দেখহ উকিনি' ইত্যাদি পদগুচ্ছে ও বাক্যে গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে উঠেছে, এমনকি কথ্যভাষার সংলাপের সঙ্গে মুখভঙ্গিটিও অপ্রকাশ থাকে নি। এতে একটা চমৎকার অভিনয়ধর্ম ফুটে উঠেছে; এরূপ নাটকীয়তা কাব্যে অতিরিক্ত রস সঞ্চার করেছে। মুকুন্দরামের কাব্যে এরূপ নাটকীয় দৃশ্য আরও অনেক রয়েছে। ঘটক বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বর-কনের যোগ্যতা সম্পর্কে বলেন : "সেই বরজুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা। খুঁজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞের সরা॥" কালকেতুর ভোজন ও শয়ন সম্পর্কে কবির বর্ণনা : "শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিটকাল। ছোট গ্রাস তোলে বীর তেআঁটিয়া তাল॥" এসব তুলনা-উপমা অলংকার প্রয়োগে কবির গ্রামীণ চেতনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বাস্তব অনুভূতি ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা এরূপ ভাষাসৃষ্টির চালিকাশক্তি রূপে কাজ করেছে।

তবে দেবী চণ্ডীর রূপবর্ণনায় মুকুন্দরাম এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভাষা ব্যবহার করেছেন। —

হুঙ্কারে ছিন্ডিয়া দড়ি পরিয়া পাটের সাড়ি
সোল বৎসরের হইল রামা
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
কেবা দিতে পারে রূপে সীমা।
চারু বলিত ভুজে কনক-কংকণ সাজে
মণিময় কাঞ্চন-নূপুর
বিমল অঙ্গের আভা কোটি চান্দ মুখশোভা
রবির কিরণ করে দূর।

বলা বাহুল্য, কবির এ ভাষা সংস্কৃতবহুল, আলংকারিক ও ওজঃগুণসম্পন্ন। একে আমরা 'পণ্ডিতি বাংলা' বা 'পোশাকি ভাষা' বলেছি। লৌকিক ও পোশাকি ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষার রূপও মুকুন্দরামের কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। ফুল্লরার কাছে দেবীচণ্ডী আত্মপরিচয় দিয়েছেন যে ভাষায়, তা ছিল নিম্নরূপ :

শুন শুন মোর বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী আইলাঙ বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি।
কুলের বহুড়ি আমি কুলের নন্দিনী আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি।
মোরে উপদেশে তোমার কিবা কাজ আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ।
আছিলাঙ একাকিনী বসিয়া কাননে আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।...
জে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব আপনার ধন দিয়া দুঃখ নিবারিব॥

'আইলাঙ', 'আছিলাঙ' ক্রিয়াপদ দুটি বাদে উদ্ধৃতির ভাষায় রয়েছে তৎসম-তদ্ভব শব্দের মিশ্রণজাত বাংলা ভাষার মানসম্পন্ন রূপ, যাকে বাংলা ভাষার মূলধারা বলা যায়। সেকালের শিক্ষিত শ্রেণি এ ভাষার অনুশীলন করতেন। মুকুন্দরামের কাব্যের মুখ্যভাগ এ ভাষাতেই রচিত হয়েছে। জর্জ গ্রিয়ার্সন বলেন, মুকুন্দরামের কাব্য Coming from the heart and not from the school.[৭] তাঁর কাব্যের উৎস হৃদয়, কোনো নির্দিষ্ট রীতি বা মতাদর্শ নয়। কবির ভাষা সম্পর্কেও উক্তিটি প্রযোজ্য, কেননা ভাষাই ভাবের বাহক। সুকুমার সেন বলেন, "বাঙ্গালা শব্দের প্রচুর ও বিচিত্র ব্যবহারে তাঁহার জুড়ি নাই। এ বিষয়ে বলিতে পারি যে শুধু চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনেই পুরানো বাংলা ভাষার অভিধান সংকলিত হইতে পারে, ব্যাকরণ গঠিত হইতে পারে।"[৮] বাঙালির মাতৃভাষার মানসম্পন্ন রূপটির নির্মাণপর্ব ষোল শতকের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেকালের কবিগণ তা আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালের কবিগণ ব্যতিক্রম ছাড়া এ ভাষাতেই কাব্যচর্চা করেছেন।

মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ ও শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় একজন বাণীসাধক ও লিপিকুশলী রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতচন্দ্রের ভাষার 'উজ্জ্বলতা'র ও 'কারুকার্যে'র প্রশংসা করে তাঁর কাব্যকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সাথে তুলনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের 'supreme literary craftsman' বলেছেন, যা মূলত কবির লিপিকুশলতা তথা ভাষাকর্মের চারুত্ব ও চমৎকারিত্বকে সূচিত করে। ভারতচন্দ্রের ভাষার ভিত্তি ছিল নগরের শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্য। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি ও

হিন্দি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করেন; বিশেষত ফারসি ভাষাজ্ঞান তাঁর সুচারু ও সরস কাব্যচর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। কাব্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি 'যাবনী মিশাল' ভাষা-প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর স্বীকারোক্তি :

মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী। উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

উক্তিটি কবির বিষয়জ্ঞান ও ভাষাচেতনার ফল। তিনি স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করার পক্ষে ছিলেন। সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতি বাংলা, নাগরিক শিষ্ট ও মার্জিত মানভাষা, গ্রামীণ লোকভাষা, এমন কি অন্দর মহলের মেয়েলিভাষা ও বাকরীতি ব্যবহার করেছেন। কতক দৃষ্টান্ত এরূপ :

(১) কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

(২) শারদ পার্বণ শ্রীধুধরানন
পঙ্কজকানন মোদিনী।
কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী
লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী॥

(৩) কত নিশান ফরফর নিনাদ ধরধর
কামান গরগর গাজে।
সব জুবান রাজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে॥

(৪) কি বলিলি মালিনী লো ফিরে ফিরে বল।
রসে তনু ডগমগ মন টলটল॥

(৫) প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে॥

(৬) বৎসর পনর ষোর বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥

(৭) তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

(৮) অরে রে হিন্দুকে পুত দেখলাও কঁহা ভুত
নহি তুঝে কুরুঙ্গ দো টুক।
না হোয় সুন্নত দেকে কলমা পড়াঁও লেকে জাতি
লেঁউ খেলায়কে থুক॥

(৯) অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভূজা॥
আদ্যা আত্মারূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছি আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া॥

১ নং উদ্ধৃতি দেবী অন্নদার উক্তি। এর সকল শব্দই তৎসম; উপরন্তু তা দ্ব্যর্থবোধক — এক অর্থে দেবীর শিব তথা পতিনিন্দা, অপর অর্থে তাঁর প্রশংসা। ২ নং উদ্ধৃতি নায়িকা বিদ্যার রূপবর্ণনা। শুধু তৎসম শব্দই নয়, এতে যুক্তাক্ষরের প্রাধান্য ও বাহুল্য রয়েছে। শব্দগুলি আভিধানিক এবং দুরুচ্চার্য; শব্দভারে যেন রূপ চাপা পড়ে যায়। ৩ নং উদ্ধৃতিতে যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। এতেও ধ্বন্যাত্মক শব্দের বাহুল্য ও অনুপ্রাসের আধিক্য রয়েছে। ৪ নং উদ্ধৃতি মালিনীর প্রতি বিদ্যার উক্তি। এতে একটিও যুক্তাক্ষর নেই, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার আছে। দেবীর ভাষা বুদ্ধিপ্রসূত, বিদ্যার ভাষা নারীসুলভ। ৫ নং উদ্ধৃতি ঈশ্বরী পাটনির; সে খেয়ানৌকা পারাপার করে। এতে সহজ সরল বাক্য আছে; এর ভাষা সাধু ও গ্রাম্যতাবর্জিত। ৬ নং ঘেষেড়ানির উক্তি। এর ভাষা গ্রাম্য ও অশ্লীল; পাটনির ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত। ৭ নং উদ্ধৃতিটি ভবানন্দের প্রথমা স্ত্রী চন্দ্রমুখীর; ধনাঢ্য পরিবারে দুই সতীনের সংলাপের ভাষায় শিষ্টতা ও চাতুর্য আছে; একটি বাংলা প্রবাদের সার্থক ব্যবহারে তা প্রকাশ পেয়েছে। এতে কোনো যুক্তাক্ষর নেই। ৮ নং উদ্ধৃতি কবিকৃত 'যাবনী মিশাল' ভাষার নমুনা; তা দিল্লির নিম্নশ্রেণির মুসলিম রাজকর্মচারীর মুখের উক্তি। এটা গালির ভাষা, বাঙালি হিন্দুদের প্রতি ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এতে বাংলা-হিন্দি-আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। ৯ নং উদ্ধৃতি চৌতিশার আঙ্গিকে রচিত 'কালীস্তুতি'। শূলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নায়ক সুন্দর দেবীর কাছে এভাবে প্রার্থনা করেছে। প্রার্থনার ভাষা কৃত্রিম; প্রথম দুটি চরণে দেবীর গুণবাচক বিভিন্ন নামের তালিকা রয়েছে। এতে ভক্তিভাব বা আধ্যাত্মিকতার নামগন্ধ নেই।

বাংলা ভাষাকে কত বিচিত্রভাবে ব্যবহার করা যায়, কবির এসব উক্তি-উদ্ধৃতির মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। ভারতচন্দ্র রায় যথার্থই ভাষার 'জাদুকর' ছিলেন। তিনি শব্দ, ছন্দ, অলংকার নিয়ে খেলতে ভালোবাসতেন। নিম্নের শ্লোকে অনুপ্রাস অলংকার ও ধ্বন্যাত্মক শব্দমিশ্রণে হিল্লোলিত এক অপূর্ব ছন্দদোলা সৃষ্টি হয়েছে। —

কি বলিলি মালিনী লো ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥

মঙ্গলকাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত : "এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই বাংলা কাব্যভাষার প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে।" কেউ কেউ মঙ্গলকাব্যকে বাঙালির 'জাতীয় কাব্য' (national poetry) বলেছেন। কাহিনিকাব্যের আখ্যান বৃহৎ, পটভূমি বিস্তৃত; এতে বাঙালির ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। কবিদের আবেগ, কল্পনা, বিবেক, বুদ্ধির আলোকপাতে বাংলা ভাষা সেসব ধারণ ও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রণয়োপাখ্যান

প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা মুসলিম কবি। ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু ইত্যাদি আরবীয় কাহিনি এবং পদ্মাবতী, সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী, গুল বকাওলী ইত্যাদি ভারতীয় কাহিনি অবলম্বনে প্রায় বিশ জন কবি কাব্যরচনা করেছেন। কাব্যগুলির মৌলিক আবেদন

মানবপ্রেম। এগুলির সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর এ ধারার রচনা কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি।

তেরো শতকের গোড়ায় মুসলিম বিজয়ের সূচনা হলেও সমগ্র বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করতে প্রায় আরও একশ বছর অতিক্রান্ত হয়। মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন ও সামাজিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে আরও একশ বছর অতিবাহিত হয়েছিল। পনেরো শতকের পূর্বে কোনো মুসলিম কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রথমে হিন্দু কবির ন্যায় মুসলমান কবিরাও বাংলা ভাষায় কাব্যরচনায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। হিন্দুর কাছে সংস্কৃত এবং মুসলমানের কাছে আরবি-ফারসি পবিত্র ভাষা; এসব ভাষার কোনো গ্রন্থের বাংলা-অনুবাদ বা কোনো বিষয় নিয়ে কাব্যরচনা পাপকার্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু সামাজিক চাহিদার কথা ভেবে সাহসী কবিগণ কালক্রমে সে দ্বিধা-শঙ্কা থেকে বেরিয়ে এসে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন।

পনেরো শতকের শেষ ও ষোলো শতকের গোড়ার দিকে পদকার আফজল, চরিতকার জৈনুদ্দিন, শাস্ত্রকার শেখ জাহিদ ও মুজাম্মিল এবং প্রণয়োপাখ্যান-রচয়িতা শাহ মোহাম্মদ সগীর আবির্ভূত হন। বহিরাগত মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত নব্য মুসলিম সমাজ আকারে-প্রকারে স্থানীয় হিন্দু সমাজের তুলনায় ক্ষুদ্র ছিল। এজন্য উভয় সম্প্রদায়ের কবির সংখ্যায় ও কাব্যের পরিমাণে অনেক তারতম্য ছিল। তবে এ কথা সত্য যে, কাব্যভাষার রূপ-প্রকৃতি-মান, শব্দসম্পদ ও প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন তারতম্য ছিল না। ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই নানা বিষয়ে অমিল ছিল বটে, কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকমের সাদৃশ্য ও মিল লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো রচনার ভাষার মধ্যে এমন গাঁটছাড়া সম্পর্ক যে, একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা যায় না।

এর প্রধান কারণ এই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মূলধারা বাংলাকে মাতৃভাষারূপেই গ্রহণ করেছিল। ষোলো শতকের কবি আবদুল হাকিম বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এভাবে :

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না যুয়াএ। নিজ দেশ ত্যাগ করি বিদেশ না যায়॥
মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি। দেশী ভাষা উপদেশ মন হিত অতি॥...
নিজ দেশী ভাষা করি গৃহতে সকল। আক্ষি সব আগে কর সংকট কুশল॥

— নূরনামা

যাঁরা 'নিজ দেশী ভাষা' হিংসা করেন, কবি তাঁদের কুলপরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে 'দেশ ত্যাগ' করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, যারা 'মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি' করে আসছেন, তাঁরাই এদেশের ভূমিজ সন্তান। তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এখানে মাতৃভাষার প্রতি কবির অপরিসীম দরদ ও আপসহীন প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। কবি বাংলা ভাষাবিরোধীদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেও তিনি অন্য কোনো ভাষার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। একই কাব্যে তাঁর উক্তি :

আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান। যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান॥
আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিত। ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥
ফারছি পড়িতে যদি বা পার কিঞ্চিত। নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥

১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দুশো বছর বাংলার সুলতানরা স্বাধীনভাবে দেশশাসন করেছেন। কোনো কোনো সুলতান নিজেকে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান' বলে পরিচয় দেন। মুঘল আমলে প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে 'সুবেহ বাঙ্গালাহ্' নাম চালু হয়। আঠারো শতকের প্রথমার্ধ কালে বাংলার নবাবরা প্রায় স্বাধীন ছিলেন। মুঘল সুবেদারগণ কেউ কেউ মেয়াদ শেষে বাংলা ছেড়ে গেলেও নবাবগণ কেউ বাংলা ছেড়ে যান নি। মুর্শিদকুলি খান ইরান, সুজাউদ্দিন গোলকুণ্ডা, আলিবর্দি খান আরব এবং মীর জাফর আলি খান ইরাকের নজফ থেকে এসেছিলেন; তাঁরা সবাই বাংলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দেশের মাটিতেই অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন। ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম হওয়ায় শাসকশ্রেণির সাথে যেসব ধর্মপ্রচারক পীর-দরবেশ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এ দেশ ত্যাগ করে যান নি; দেশের নানা স্থানে তাঁদের বিদ্যমান মাজার-মকবারা থেকে তা প্রমাণিত হয়। গৌড়ের রাজনৈতিক সংকটকালে শেখ আলাউলের দরবেশ-পরিবার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজা গণেশের অভ্যুত্থানে শঙ্কিত হয়ে শেখ আলাউলের পুত্র নূর কুতুব-ই-আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে পত্রমারফত গৌড় আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান; রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে উক্ত সংকটের অবসান হয়। সুতরাং মুসলিম শাসকগণ ও তাঁদের সহযোগী শ্রেণি বহিরাগত হলেও তাঁরা বাংলাকে আপন আবাসভূমি (home) রূপেই গ্রহণ করেছিলেন, উপনিবেশ (colony) রূপে নয়।

আমরা পনেরো শতককে মুসলিম সমাজের গঠনপর্ব বলেছি, মধ্যযুগের বাকি তিনশ বছরে সমাজ আরও প্রসারিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতা ও অধিকার-সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে অনেক প্রতিভাধর কবিও আবির্ভূত হয়েছেন; তাঁরা উন্নতমানের নতুন নতুন কাব্যরচনা করে জাতিকে উপহার দিয়েছেন। সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজির বাহরাম খান, কাজি দৌলত, আলাওল, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মর্তুজা, আলী রজা, হেয়াত মামুদ প্রমুখ প্রথম শ্রেণির কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মুসলমান কবিদের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা বেশির ভাগই সভাকবি অথবা নগরকবি ছিলেন। তাঁরা শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায়, নাগরিক চেতনায় ও বাকবৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষত, আলাওলের অবদান ছিল অতি উন্নতমানের; বাংলা ভাষাকে তিনি সর্বাধিক উৎকর্ষ দান করেন। তাঁর *পদ্মাবতী* কাব্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনবদ্য অবদান। এর ভাষায় আছে একদিকে ধ্রুপদী মহিমা, অপরদিকে রোমান্টিক সৌন্দর্য। ভারতচন্দ্র 'কাব্যরস'কে প্রাধান্য দিয়ে 'যাবনি মিশাল ভাষা' প্রয়োগেও কার্পণ্য করেন নি। আলাওল ভাষার প্রশ্নে কোনোকিছুর সাথে আপস করেন নি, বা কোনোরূপ লঘুভাব বা চপলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। বিশেষত তাঁর পদ্মাবতী একটি আদ্যন্ত ও অভিন্ন নিখুঁত শিল্পিত কাব্যভাষ্য। এতে তাঁর ভাষায় আবেগের স্থান কম, বুদ্ধিবৃত্তির স্থান বেশি। ভারতচন্দ্র ছিলেন ভাষার দক্ষ কারিগর ও কুশলী শিল্পী, কিন্তু আলাওল ছিলেন ভাষার বিদগ্ধ রূপকার ও মেধাবী শিল্পী।

সংস্কৃতানুসারিতা আলাওলের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর তৎসম শব্দ প্রয়োগে ও অলংকৃত বাক্য নির্মাণে সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি *পদ্মাবতী* কাব্যে লৌকিক ও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন নি বললেই চলে। *তোহফা* ফারসির অনুবাদ হলেও 'নাম-শব্দ' (technical term) ব্যতীত এতে আরবি-ফারসি কমই আছে। তাঁর অন্যান্য কাব্য সম্বন্ধে একই মন্তব্য করা যায়। *পদ্মাবতী*র ২৪-চরণের 'নাত' (রসুল-প্রশস্তি) অংশে 'কোরান' ও 'দ্বীন' এ দুটি আরবি শব্দ আছে। আল্লাহর (আরবি) বা খোদার (ফারসি) প্রতিশব্দ 'প্রভু', 'নিরঞ্জন' ও 'করতার' ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ নির্বাচনে *পদ্মাবতী* কাব্যে আলাওলের যে সংস্কৃত ভাষাভিমান বা প্রীতি ছিল, বার্ধক্যকালে তা শিথিল হয়। শেষ কাব্য *সিকান্দরনামায়* ভাষার গাঁথুনি কিছুটা শিথিল ও লঘু হয়েছে। বার্ধক্যজনিত কারণে কবির কল্পনা ও চিন্তাশক্তি তখন হ্রাস পেয়েছিল, নচেৎ তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কাব্যের মাঝে মাঝে কবি-প্রতিভার দীপ্তি স্ফুলিঙ্গবৎ বিস্ফুরিত হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যচর্চায় আলাওল আজীবন একটা মানভাষা ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

পদ্মাবতী আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা। কাব্যখানিকে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত ও কলকাকলিতে মুখরিত একটি সাজানো বাগান বলে প্রতিভাত হয়। প্রাচীন কালের কাব্যের যে তিনটি প্রধান গুণ — ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য গুণ, *পদ্মাবতী* কাব্যে তা বিদ্যমান। রচনার গাঢ়বদ্ধতা ওজোগুণ, রচনার অনায়াস অর্থবহতা প্রসাদগুণ এবং রচনার চিত্তের আকর্ষণ-শক্তি মাধুর্যগুণ। বাক্যের শব্দ নির্বাচন, সুষম বিন্যাস ও অর্থ-মাহাত্ম্য দ্বারা কাব্যের এসব গুণ বিকশিত হয়।

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘাঁঘর বাজএ ঝাঁঝর
ঝনঝন নেপুর মধুর গীতা॥
ভুরু বিভঙ্গ অপাঙ্গ তরঙ্গ
মন্মথ মনমোহিতা।
গুম্ফিলেক কেশ কুঙ্কুম সুবেশ
সিন্দুর চন্দন তিলক তথা।
সঘন রাতি তারকা পাঁতি
বান্ধুলি রত্ন বিরাজিতা॥

'কন্যা সমর্পণ' খণ্ডের একটি গানের অংশ-বিশেষ এই চরণগুলিতে ওজঃ, প্রসাদ ও মাধুর্য গুণের সমন্বয় ঘটেছে। আলাওলের শব্দ ও ধ্বনি চেতনা প্রখর ছিল। একদিকে কবি ও অন্যদিকে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই এরূপ ধ্বনিসৌন্দর্য ও চিত্রসৌকর্য সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনটি তদ্ভব শব্দ (ঘাঁঘর, রাতি, পাঁতি) এবং একটি ক্রিয়াপদ (বাজএ) ছাড়া সকল শব্দই তৎসম। ছন্দের কারণে এরূপ তদ্ভব শব্দের ব্যবহার, নচেৎ এগুলির তৎসম রূপ ঘুঙ্গুর, রাত্রি ও পঙক্তি-র ব্যবহার কাব্যের অন্যত্র আছে। গানে তৎসম শব্দ ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। সাধারণ বর্ণনাতেও তৎসম শব্দ ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার কবির পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছিল। যথা —

মহীগঞ্জ শিলাধান্য দূর্বা পুষ্পফল।
দধি ঘৃত শঙ্খ আর সিন্দুর কাজল॥
এ সকল প্রত্যক্ষে কপালে প্রসারিয়া।
প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্পেত থুইয়া॥

এটি 'বধূ বরণে'র চিত্র। 'কাজল' (<কজ্জল) ব্যতীত আর কোনো তদ্ভব শব্দ নেই। কুলার স্থলে 'সূর্প' শব্দের প্রয়োগ আলাওলের আভিধানিক শব্দপ্রীতির ইঙ্গিত বহন করে। আলাওলের কাব্যে এরূপ প্রচলিত-অপ্রচলিত সংস্কৃতবহুল অজস্র শব্দ রয়েছে, যার উৎস ছিল অমরকোষাদি সংস্কৃত অভিধান। সেকালে যাঁরা সংস্কৃত শিখতেন, তাঁরা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অভিধান পড়তেন। অভিধানে সমার্থক শব্দ আর্যাকারে লেখা হত — শিক্ষার্থীরা তা মুখস্থ করতেন। আলাওল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও গাম্ভীর্য দান করেছেন, বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেছেন। *পদ্মবতী* কাব্য থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

১. সিংহল দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা

সরোবরে নামি জল তোলএ জীমূত। উথলএ মৎস যেন চমকে বিদ্যুৎ॥
হংস চক্রবাক আদিচরে জলচর। সিতাসিত রক্তপীত নানা বর্ণ ধর॥
নিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মনোদুঃখে। দম্পতি দিবসে কেলি করে মহাসুখে॥
কুররএ সারস করএ নানা রঙ্গ। মরণে যে দম্পতি এক সঙ্গ॥
সঙ্কট শালিক আর ডাহুক জলকাক। করণ্ডক বক শ্বেত শুক ঝাঁকে ঝাঁক॥
অমূল্য রতন মুক্ত বৈসে সেই জলে। মজিআ ডুবিলে মাত্র পাএ ভাগ্যবলে॥

২. পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা

প্রভারুণ বর্ণ আঁখি সুচারু নির্মল। লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল॥
কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত। খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জনে রঞ্জিত॥
আঁখিতে পোতলি শোভে রত্ন শ্বেতান্তর। ভুলিত কমল রসে নিশ্চল ভ্রমর॥
কিঞ্চিত লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হএ মুনি মন ভঙ্গ॥
ঈষৎ চালনি সুভঙ্গিমা আঁখি সানে। ত্রিজগৎ প্রাণ হরে কটাক্ষ সন্ধানে॥
সদামত্ত চঞ্চল ঘূর্ণিত সুলজ্জিত। শ্বেতারুণ সুঅঞ্জন রেখায় বর্ণিত॥

কতক বাক্য আছে, যা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও হার মানায়। সূর্যোদয় হলে আকাশে চন্দ্রের আভা ম্লান হয়ে যায়। কবি লিখলেন — "মার্তণ্ড প্রকাশে জ্যোতিহীন হএ শশী।" সূর্যের আলোয় চন্দ্র আলোকিত হয়। কবি লিখলেন — "মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা।" অন্য দৃষ্টান্ত — "শশী নিষ্কলঙ্ক মুখী পঙ্কজ নয়ানী।"

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল আলাওলের ভাষাকে 'বিশুদ্ধ বাংলা' বলেছেন। তাঁর মন্তব্য :

Alaol's *Padmavati* is written in chaste Bengali with an abundance of *Tatsama* and *semi-tatsama* words. Even in his eulogies of God and the Prophet, the Bengali poet has not deviated from his uniform style of Sanskrit chaste Bengali. A number of words, unfamiliar in standard Bengali, are traceable directly to the Hindi source.[৯]

অলংকৃত বাক্যগঠনে আলাওল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর আখ্যানকাব্যের ভাষা, বিশেষত *পদ্মাবতীর* ভাষা অলংকারবহুল। পদ্মাবতীর অঙ্গসৌন্দর্য ও রূপচর্চা বর্ণনায় আলাওলের অলংকারপ্রীতি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, উল্লেখ, রূপক, ব্যতিরেক, অনুপ্রাস, যমক, অতিশয়োক্তি, সাদৃশ, ভ্রান্তিমান ইত্যাদি অলংকার কাব্যের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনার ৩৩০টি চরণের মধ্যে অধিকাংশ চরণ অলংকৃত। অঙ্গের গঠন, দ্যুতি ও অপূর্বতা বোঝাবার জন্য উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, অনুপ্রাস ইত্যাদি অলংকার বেশি রয়েছে। কিছু অলংকার মূলানুগ, আবার আলাওলের সৃষ্ট অলংকারও আছে, যা পদ্মাবতীর আন্তর-আবেগ ও যৌবন-চাঞ্চল্যকে পরিস্ফুট করেছে। পদ্মাবতীর মুখকান্তি ও চোখের দীপ্তি দেখে অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আলাওলের ভাষায়—

কিবা মুখ চন্দ্র আঁখি অরুণ দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে যেন তিমিরের হিয়া৷৷

প্রথম চরণে চন্দ্রের সঙ্গে মুখের, অরুণের সঙ্গে চোখের তুলনা দেওয়া হয়েছে; এটি মালোপমা অলংকার। দ্বিতীয় চরণটি অতিশয়োক্তির দৃষ্টান্ত। ঘন কাল কেশের বর্ণনা —

আপাদলম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।
মহা অন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব৷৷
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠবে কেহ নহে সমসর৷৷

অলি, পিক, ভুজঙ্গ, চামর, জলধর (মেঘ) — সবই কৃষ্ণবর্ণ, কালো কেশের রং এগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। "মহা অন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব৷৷" — অতিশয়োক্তি অলংকার। আলাওলের এরূপ অলংকারপ্রীতি সম্পর্কে সমালোচক বলেন, "আখ্যানকাব্যে অলংকৃতশৈলীর পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন আলাওল এবং দ্বিজ রামদেব। এঁরা দুজনেই সমকালীন এবং সমতট অঞ্চলের লোক।" তিনি আরও বলেন, "ভারতচন্দ্র এই রীতিনিষ্ঠ কাব্যের ভাষা নির্মাণ সম্পর্কে পথিকৃৎ হওয়ার দাবী করতে পারেন না, যদি কেউ পারেন তিনি আলাওল।"[১০]

দোভাষিপুথি

আঠারো শতকে মুসলমান কবিদের চেষ্টায় গড়ে-ওঠা দোভাষিপুথির ভাষা হাজার বছরের বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটা দলছুট কৃত্রিম ভাষা। আবার কৃত্রিম ভাষাই বা বলি কেন? যে ভাষার সৃষ্টিমূলে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভূমিকা রয়েছে, প্রায় একশ-দেড়শ বছর ধরে যে ভাষায় বহুসংখ্যক কবি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেছেন, ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়ে যেসব গ্রন্থ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ আগ্রহভরে পাঠ করে তাদের সাহিত্যরস-পিপাসা মিটিয়েছে, সেসব কাব্য ও কাব্যভাষাকে কৃত্রিম বা অধঃপতিত বলা কি সংগত হবে? বিশেষত বাংলার মুসলিম সমাজে এ ভাষার জনপ্রিয়তা এক সময় তুঙ্গে উঠেছিল। তবে একথাও সত্য যে, দোভাষিপুথির ভাষা মূলস্রোতের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না, যার কারণে কালচক্রে এ ভাষার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এক সময় সম্পূর্ণ লোপ পায়।

দোভাষিপুথির ভাষা এখন সম্পূর্ণ মৃত, শত-সহস্র পুথিকাব্য গ্রন্থাগারের অন্ধ কুঠরিতে তাকবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে সৈয়দ গরীবুল্লাহ *আমীর হামজা* নামক কাব্য রচনা করে দোভাষিপুথির সূচনা করেন। তিনি কাব্যখানি শেষ করতে পারেন নি, তাঁর যোগ্যশিষ্য সৈয়দ হামজা ১৭৯৪ সালে সুবৃহৎ এই কাব্যখানি সমাপ্ত করেন। তিনি *জৈগুনের পুথি* (১৭৯৮) ও *হাতেম তাই* (১৮০৩) নামে অপর দুখানি দোভাষিপুথি রচনা করেন। এরপর এ ধারার কাব্যরচনায় জোয়ার আসে।

দোভাষিপুথির ভাষা দুই ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এতে বাংলার সাথে আরবি, ফারসি, হিন্দি, উর্দু ভাষার শব্দ, পদবন্ধ, বাক্‌ভঙ্গি ইত্যাদি মিশে এক মিশ্ররীতির সৃষ্টি করেছে। আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য ও মুসলিম সমাজে এর প্রাধান্য থেকে একে 'মুসলমানি বাংলা' বলেও আখ্যাত করা হয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সম্ভবত একই চেতনা থেকে একে 'যাবনী মিশাল' ভাষা বলেছিলেন। এরূপ ভাষাকে একেবারে ভুঁইফোঁড় বলা যাবে না। গরীবুল্লাহ হুগলি জেলার ভুরসুট পরগনার বালিয়া-হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভারতচন্দ্র রামচন্দ্র মুনশির কাছে ফারসি শিখতে গিয়েছিলেন; তিনিও ভুরসুট পরগনার অধিবাসী ছিলেন। ভারতচন্দ্র সেখানেই যাবনি মিশাল ভাষার সাথে পরিচিত হন। মানসিংহ ও বাদশাহর মধ্যে 'আরবী ফারসী হিন্দুস্থানী' মিশ্রিত যে ভাষায় সংলাপ হয়েছে, কবি সে ভাষা সেখানেই শিখেছিলেন। সম্ভবত দোভাষি বাংলা ভুরসুট পরগনার এক শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা ছিল, আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায়, ওই অঞ্চলের মুসলমানের পারিবারিক ভাষা ছিল তা। কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে, মুঘল শাসন আরও কিছুকাল স্থায়ী হলে হয়তো এটাই বাংলার মানুষের মাতৃভাষা হত।

দোভাষিপুথির ভাষা নিছক বর্ণনামূলক; এর উপরে আছে পয়ার-ত্রিপদীর সুরেলা ছন্দের মাদকতা। দোভাষিপুথির ভাষায় কোনোরূপ দ্রোহচেতনা নেই; এতে আছে একপ্রকার অতীতচারিতা, যা পাঠককে স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু এসবই ছিল যুগের সাথে সম্পর্কহীন, যার ফলে পুথিসাহিত্য সমাজের গভীরে শিকড় গজাতে পারে নি। আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের সাথে সাথে দোভাষিপুথি চর্চায় ভাটা পড়ে, এবং দ্রুত উত্থানের মতো অতি দ্রুত লোপ পায়। দোভাষিপুথির স্থান দখল করে মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যপুস্তক *বিষাদসিন্ধু* (১৮৮৭); এটিও দীর্ঘকাল মুসলমানের ঘরে ঘরে প্রচারিত ও পঠিত হয়েছে।

বাউল গান

বাউল গান প্রধানত উনিশ শতকে রচিত হয়। লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) এ ধারা গানের প্রবর্তক, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। আধুনিক যুগ প্রবর্তিত হলেও বাউল গানের ভাব-ভাষায় নবযুগের প্রভাব পড়ে নি। নগরের আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয়; বাউল গানের ধারক-বাহক-পৃষ্ঠপোষক ছিল আবহমান গ্রাম-বাংলার শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের মানুষ। অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত বাউলগণ মধ্যযুগীয় ধর্মীয়চেতনা ও

মূল্যবোধের প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বাউলকবি পদাবলির আঙ্গিকে ভনিতা সংযুক্ত করে স্বরচিত গানের মালিকানা নিশ্চিত করতেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে অসমবিকাশ তত্ত্বের (কার্ল মার্ক্স কথিত) আলোকে বাউল গানের এরূপ পশ্চাৎগামিতার কথা স্বীকার করতে হয়।

বাউল গানের বিষয় ধর্মতত্ত্ব, যা ব্যক্ত নয়, গুপ্ত। এরূপ গানের ভাষা সহজেই জটিলরূপ ধারণ করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। বাউল কবিগণ জটিল বিষয় সহজ করে বলেছেন। তবে তত্ত্বের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে তাঁরা রূপক-প্রতীক-সংকেতের আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে বাউল গানের ভাষাভঙ্গি আপাতত সহজ হলেও প্রকাশরীতির কারণে গানের বিষয় সকলের বোধগম্য নয়। তাঁরা হৃদবিহারী; নিজের সাথে নিজেই কথা বলেন। তাঁরা ভাষার ক্ষেত্রে একটা আলাদা জগত সৃষ্টি করেছেন, যার রূপ ও স্বাদ অভিনব ও স্বতন্ত্র। কবিগণ সমকালের প্রচলিত মানভাষাকে অবলম্বন করে তার ওপর তত্ত্বের পরিভাষা আরোপ করে এরূপ স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ভাষারীতি নির্মাণ করেছেন। বাংলা মানভাষার উদ্ভবস্থল নদীয়া-কুষ্টিয়া জেলা। লালনসহ প্রধান বাউল কবিরা কুষ্টিয়া ও তৎসংলগ্ন যশোর, নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তাঁরা জন্মসূত্রে মানভাষার উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক যাঁরা বাংলা ভাষাকে নিয়ে খিস্তিখেউড় করেছেন, তাঁরা কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। লালনের ভাষার মান অনেক উন্নত ছিল। পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, কুবীর গোঁসাই, যাদুবিন্দু প্রমুখ বাউলকবি সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যায়।

সুর-লয়, ছন্দ-মিল সংবলিত বাউল গানের ভাষা প্রায় গদ্যধর্মী। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :

১. এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে।
কত মুনি-ঋষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে ঘুরে॥ — লালন শাহ

২. গুরু দয়া কর মোরে গো, বেলা ডুবে এল।
তোমার চরণ পাবার আশে রইলাম বসে, সময় বয়ে গেল॥ — পাঞ্জু শাহ

৩. আমি কিরূপে পাব গুরুর শ্রীচরণ।
আমার হয় না সুদিন, যায় না দুঃখের দিন॥ — বণিক চাঁদ

উদ্ধৃতিগুলিতে একটিও দুর্বোধ্য শব্দ নেই; এমন কি, যুক্তাক্ষরের ব্যবহারও সীমিত। প্রথম উদ্ধৃতির দ্বিতীয় চরণের 'বেড়াচ্ছে ঘুরে' যৌগিক ক্রিয়াপদটির স্থান পরিবর্তন করে 'ঘুরে বেড়াচ্ছে' লিখলে চলতি মৌখিক গদ্য পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে তৃতীয় উদ্ধৃতির প্রথম চরণের 'পাব' ক্রিয়াপদটি শেষে নিয়ে গেলে 'আমি কিরূপে গুরুর শ্রীচরণ পাব।' — খাঁটি গদ্যরূপটি পাওয়া যায়।

এরূপ গদ্যধর্মী সহজ সরল ভাষায় অনেক বাউল গান রচিত হয়েছে। তারপরেও বলতে হয় — এ ভাষা গানের ভাষা, গীতিকবিতার ভাষা। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গূঢ় রহস্যকথা কবিতার ছন্দ, মিল ও অলংকারে বিভূষিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। কবিগণ উপমা, রূপক অলংকারাদি লৌকিক জীবন থেকে নিয়েছেন সত্য, তবে তত্ত্বের মোড়কে তা অলৌকিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে।

বাউলরা গায়ক-পাখি, শেখা বুলি ছাড়া অন্য কথা বলেন না। এদিক থেকে যেমন বাউল-ভাবনার সীমাবদ্ধতা আছে, তেমনি ভাষারও সীমাবদ্ধতা আছে। কতক ধর্মীয় পরিভাষাকে পুঁজি করে তাঁরা কবিতার কারবার করে থাকেন। বাউল কবিরা ভাবভাষার ক্ষেত্রে এরূপ সীমাবদ্ধতা নিয়েও প্রকাশোপযোগী নিজস্ব ভুবন রচনা করতে পেরেছেন, যা একেবারেই অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলির আদর্শে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেন। তিনি বাউল গানের ভাবসুর অনুসরণে অনেক গান রচনা করলেও ভাষার অনুকরণ করেন নি, কারণ তা ছিল আয়ত্তের বাইরে। তিনি এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কবি বলেন, "নিঃসংশয়ে জানি বাউল সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকালের আধুনিক।... আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি। সেগুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্র-বাউলের রচনা। কাব্য পরিচয়ে যে বাউলের গানগুলো আছে, সে আমার মাথায় কিম্বা কলমে আসত না; লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়তুম।"

বাউলরা মরমি কবি। তাঁরা নিজেদের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধনার কথা প্রকাশ করার জন্য নিজস্ব পরিভাষা গড়ে তুলেছেন। তাঁরা কতক ক্ষেত্রে ঐতিহ্য থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন, তবে অনেক বিষয় নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছেন। প্রধানত হিন্দু-বৌদ্ধ-সুফি সাধনা থেকে নানা পদ বা পদগুচ্ছ গৃহীত হয়েছে, যা প্রয়োগকৌশলে পারিভাষিক রূপ ও মরমিব্যঞ্জনা লাভ করেছে। গানের ভাব-তত্ত্ব-দর্শনের মতো ভাষা মুখ্যত দুই সংস্কৃতি থেকে গৃহীত হয়েছে — একটির উৎস সংস্কৃত ভাষা, অপরটির উৎস আরবি-ফারসি ভাষা। হিন্দু-বৌদ্ধ ভাবধারার গীতিপদে সংস্কৃত শব্দের এবং সুফি ভাবধারার গীতিপদে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার বেশি আছে। আবার উভয় ভাষার মিশ্রণে রচিত হয়েছে এমন গীতিপদও আছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে বাউল পরিভাষাগুলিকে নিম্নরূপে তালিকাভুক্ত করা যায় :

ক. সংখ্যাশ্রিত : দ্বি-দল, যুগলরূপ, তিন রতি, ত্রিধারা, চারিচন্দ্র, চার রং, পাঞ্জাতন, পঞ্চতত্ত্ব, ষটচক্র, ছয় বোম্বেটে, আট কুঠরি, নয় দরজা, দশম দ্বার, দশম দশা, চৌদ্দ ভুবন, চৌদ্দ পোয়া, ষোল কলা, আঠার মোকাম, বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলি, লক্ষ যোজন ইত্যাদি।

খ. যোগাশ্রিত : শ্বাস-প্রশ্বাস, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্ন, নীর-ক্ষীর, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, ত্রিবেণী, রাগের ঘর, রাগের কিরণ, পূরক-রেচক-কুম্ভক, অমাবস্যা, বারামখানা, স্থুল-প্রবৃত্তি-সাধক-সিদ্ধি, জোয়ার-ভাটা, ইল্লিন-সিজ্জিন, উজান বাঁকে, আগম-নিগম, কামরূপ ঘাট, মণিপুর, মোকাম বা লতিফা।

গ. প্রতীকাশ্রিত : অচিন পাখি, সহজ মানুষ, মনের মানুষ, পড়শী, মীন, আরশি নগর, আয়না মহল. অরূপ রতন, কল্পতরু, আনন্দ বাজার, মন-মাঝি, মনুরায়, পতিত পাবন, আজব ফুল, পূর্ণচন্দ্র বা পূর্ণশশী, মেঘনা নদী, বৈদিক মেঘ, ঠক বাজার, সদরকোঠা. রংমহল, বর্জক, আলেক শহর ইত্যাদি।

ঘ. ভাবাশ্রিত : হৃদ-কমল, হৃদ-মাঝার, দয়াল গুরু, চেতন গুরু, জেন্তে মরা, ভবের কাণ্ডারী, রসের ভিয়ান, রূপের ঝলক, ভাবের বাড়ি, ভাবের তালা, নেহার করা, বেহাল হওয়া ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত পদ ও পদগুচ্ছ (clitche) অধিকাংশই হিন্দু-বৌদ্ধ যোগসাধনা ও দেহতত্ত্ব থেকে এসেছে। সুফি-বাউল সাধনা ও তত্ত্বাশ্রিত পরিভাষাও রয়েছে। গানের অন্তর্নিহিত

ভাব-রস-মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এগুলোর ব্যাখ্যা ও পটভূমি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। এখানে হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্র ও সুফি-বাউলতত্ত্ব আশ্রিত কতক সাংকেতিক শব্দ ও পারিভাষার **অর্থ প্রদান করা হলো :**

অচিন পাখি	অন্তর্যামী, আরাধ্য দেবতা; অন্যান্য পরিভাষা বা প্রতিশব্দ — অধরা, অটল, আলেখ সাঁই, পড়শী, মীন, মনের মানুষ, সহজ মানুষ, পূর্ণচন্দ্র বা পূর্ণশশী, পরমবস্তু, প্রেম-রত্ন ইত্যাদি।
অমাবস্যা	নারীর ঋতুকাল; বিশেষত প্রথম তিন দিন ঘোর অন্ধকারময় সময়। কাম বা দেহভোগের কাল বলে একে অন্ধকার তথা অবাবস্যা বলা হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন অমাবস্যাতেই 'পূর্ণচন্দ্র' রূপ সহজ মানুষের উদয় হয়। কাম হলো অমাবস্যা, আর প্রেম হলো পূর্ণিমা। এজন্য বাউল কবি বলেন, 'অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়'।
অষ্টপ্রহর	নারীর ঋতুস্রাব বা কারণ-বারির আবির্ভাবের পর প্রথম ২৪ ঘন্টাকে 'অষ্টপ্রহর' বলে।
আরশি নগর	মানবদেহ;
ইল্লিন-সিজ্জিন	আরবি শব্দ; শেষবিচারের পর পুণ্যাত্মা বেহেস্তে প্রবেশের পূর্বে ইল্লিন এবং পাপাত্মা দোজখে প্রবেশের পূর্ব সিজ্জিন নামক স্থানে অবস্থান করবে।
কারণ-বারি	নারীর ঋতুস্রাব; এর অপর নাম 'রসরতি'।
ছয় বোম্বেটে	ষড়রিপু — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য;
তিন রতি	সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা; গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এর উল্লেখ আছে।
তিন রস	গরল-রস, শাম্ভু-রস ও অমৃত-রস; তিন রসের সাথে তিন রতির সম্পর্ক রয়েছে— গরল-রসে সাধারণী, শাম্ভু-রসে সামঞ্জস্য এবং অমৃত-রসে সমর্থা রতি বিরাজ করে। রস-রতির মিলনসাধনই বাউলসাধকের মূল লক্ষ্য।
নয় দরজা	মানবদেহের ছিদ্রবিশেষ — ২ চক্ষু, ২ কর্ণ, ২ নাসারন্ধ্র, ১ মুখ, ১ পায়ু ও ১ উপস্থ (লিঙ্গ, যৌন)।
নীর-ক্ষীর	নারীর রজঃ 'নীর', পুরুষের বীর্য 'ক্ষীর' রূপে অভিহিত হয়। রজঃ জলীয় পদার্থ — তাই এরূপ নামকরণ হয়েছে। লাল জলীয় পদার্থ হওয়ায় নীরের অপর নাম 'শোণিত'। সৃষ্টির মূলে আছে বীর্য বা ক্ষীর; নীর তাকে ধারণ করে বলে একে 'কারণ বারি'ও বলা হয়। নীর-ক্ষীরের মিলিত রূপ সহজ মানুষের স্বরূপ — একটি মাতৃশক্তি, অপরটি পিতৃশক্তি। এই অর্থেই সহজ মানুষকে 'যুগলরূপে' অভিহিত করা হয়। ত্রিবেণীতে নীর-নদী ও ক্ষীর-নদী রূপে যুগলের অবস্থান।
দ্বি-দল	ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত আজ্ঞাচক্র, যা দ্বি-দল বা দুই পাপড়িবিশিষ্ট পদ্মের উপর স্থিত।
ত্রিবেণী	মানবদেহের মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত বামে ইড়া, ডানে পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়িত্রয়; যৌনাঙ্গের নিকট মূলাধারে নাড়িত্রয় মিলিত হয়েছে। এগুলির সঙ্গম বা মিলনস্থলকে ত্রিবেণী বলে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার অপর নাম গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। বৈষ্ণবতন্ত্রে নাড়িত্রয়ের নাম তারুণ্য, কারুণ্য ও লাবণ্য। বাউলরা নারীর প্রতিমাসে রজঃস্রাবকে ত্রিবেণীর ত্রিধারা বিশিষ্ট নদী-প্রবাহ বলে মনে করে। তারা এক 'শ্রীরূপ-নদী', 'রূপ-সাগর', 'সিন্ধু' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করে থাকে।

চারিচন্দ্র	রজঃ, বীজ (শুক্রকীট), মল ও মূত্র; বাউলরা রজঃকে তেজ (অগ্নি), শুক্রকে মরুৎ (বায়ু), মলকে ক্ষিতি (মাটি) ও মূত্রকে অপ (জল) বলে মনে করে।
পঞ্চতত্ত্ব	সাংখ্য মতে — ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম;
পাঞ্জাতন	সুফিমতে পঞ্চ মহাজন — হজরত মহম্মদ (স.), কন্যা ফাতেমা, জামাতা আলী ও হাসান-হোসেন দুই দৌহিত্র।
পূরক-কুম্ভক-রেচক	যোগসাধনার ত্রিবিধ উপায় বা পন্থা — বাম নাসিকা দ্বারা শ্বাসগ্রহণকে পূরক, কিছুক্ষণ দম ধরে রাখা বা শ্বাসরোধকে কুম্ভক এবং ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাসত্যাগকে রেচক বলে। আবার বিপরীত পদ্ধতিতে অর্থাৎ ডান নাসিকায় শ্বাসগ্রহণ, মাঝখানে শ্বাসরোধ এবং বাম নাসিকায় শ্বাসত্যাগ করতে হয়। এ প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলে।
ফুল	ঋতুস্রাবের পারিভাষিক নাম 'পুষ্প' বা 'ফুল'; বাউলগানে 'যোনিপদ্ম', 'রাধাপদ্ম', 'অষ্টদলপদ্ম' ইত্যাদি নামে এর ব্যবহার রয়েছে।
বৈদিক মেঘ	যাগযজ্ঞাদি বেদাচার;
বর্জক	আরবি শব্দ; মৃত্যুর পর শেষবিচারের দিন পর্যন্ত আত্মার অবস্থান স্থল, বাউল গানে মধ্যস্থতাকারী বা গুরু অর্থে গৃহীত। বারামখানা বারাম (<বার, ফা. + আম আ. অর্থ- আসর) + খানা (<খানাহ্ ফা., অর্থ- ঘর, কক্ষ); বিশ্রামঘর, বৈঠকখানা। পুরুষ-প্রকৃতি বা ভোক্তা-ভোগ্যের লীলাস্থল আজ্ঞাচক্রকে বারামখানা বলা হয়। মূলাধারে ভোগমুখী কাম ঊর্ধ্বগামী হয়ে আজ্ঞাচক্রে তুরীয় প্রেমানন্দে রূপান্তরিত হয়।
বিন্দু	শূক্র বা বীর্য; বাউলরা বিন্দুকে দেহের সারবস্তু বলে মনে করে। বিন্দুকে অচল, অটল রাখা বাউল সাধনার মূল লক্ষ্য। বিন্দুধারণেই জীবন, ক্ষয়েই মরণ। একে পরমসম্পদ, মহাজনের মাল, পুঁজি ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।
মহাযোগ	নারীর রজঃস্রাবের প্রথম তিন দিন; অমাবস্যা, অম্বুবাচী ইত্যাদি এর অপর নাম।
মীন	মনের মানুষের অপর নাম মীন; ঋতুস্রাবের প্রথম তিন দিনে ত্রিবেণীর ত্রিধারা-প্রবাহের এটা জোয়ারের কাল; মনের মানুষ মীনরূপে এই জোয়ারে আবির্ভূত হয়। বাউলসাধক ত্রিবেণীর ঘাটে মীনকে ধরার সাধনা করেন।
মোকাম/লতিফা	সুফিমতে সাধনার পাঁচটি স্তর — নাসুত, মালাকুত, জবরত, লাহুত ও হাহুত।
যুগল রূপ	প্রকৃতি-পুরুষের প্রেমময় মিলন রূপ;
রস-রতি	রজো-বীজের মিশ্রণ; একে কারণ-বারিও বলা হয়।
রসের ভিয়ান	অমাবস্যা তথা নারীর ঋতুকালীন প্রথম তিন দিন রস-রতি পান করাকে রসের ভিয়ান বলা হয়। এর অপর নাম 'রসের পাক', 'চন্দ্র-ভেদ' ইত্যাদি।
ষটচক্র	মূলাধর, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র মতে — ষটচক্র পদ্মদল বা পাপড়ির ওপর প্রতিষ্ঠিত; দলের সংখ্যা মূলাধরে ৪, স্বাধিষ্ঠানে ৬, মণিপুরে ১০, অনাহতে ১২, বিশুদ্ধে ১৬ এবং আজ্ঞায় ২।
ষোলকলা	চন্দ্রের ষোলকলা — পূষা, যশা, সুমনসা. রতি, প্রাপ্তি, ধৃতি, ঋদ্ধি, সৌম্য, মরীচি, অংশুমালিনী, অঙ্গিরা, মশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি ও অমৃতা।
হৃদ-কমল	বাউলদের অন্তর্মুখী সাধনার নিজস্ব পরিভাষা; এরূপ হৃদ-মাঝার, হৃদ-বিহারী, সাধ-বাজার, রূপের ঝলক ইত্যাদি।[১১]

উপরের তালিকা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, বাউল কবিগণ বাংলা ভাষাকে তত্ত্বের মোড়কে আবৃত করে এক রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন বটে, কিন্তু অন্যের জন্যে প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে চর্যাপদকারগণ প্রত্ন-বাংলাকে তাঁদের ধর্মতত্ত্বের মোড়কে আবৃত করে আধ্যাত্মিকতার রহস্যজাল রচনা করেছিলেন। বাউলরা বৌদ্ধসহজিয়াদের উত্তরসূরি। প্রথমে নাথযোগী, পরে বৈষ্ণব সহজিয়া ও মুসলমান ফকির সম্প্রদায় মাঝের সংযোগসেতু রক্ষা করেছে।

লালন শাহ হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির উপাদান ব্যবহারে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। দুটি উদাহরণ দেওয়া যায় :

(১) ধর রে অধর চাঁদে রে, অধরে অধর দিয়ে॥
ক্ষীরোদ-মিথুনের ধারা
ধর সে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরা, দেখ রে সচেতন হয়ে॥
অরসিকের ভোলে ভুলে
ডুবিস নে কূপ-নদীর জলে
কারণ বারির মধ্যস্থলে, ফুটেছে ফুল অচিন দলে।
চাঁদ-চকোরা তাহে খেলে, প্রেম-বাণে প্রকাশিয়ে॥

(২) নবীর তরিকাতে দাখিল হলে সকল জানা যায়।
কেন রে মন কলির ঘোরে ঘুরিস ডাইনে বাঁয়॥
ওগো আইনে বিছমিল্লা বর্ত
মূল বটে তার তিনটি অর্থ
আগাম জানিলে সত্য, সে ভেদ ডুবে জানতে হয়।
ওরে আলী নবী খুদবুদ খোদা
এই চারি কভু না হয় জুদা
আদমকে জানাইলে সেজদা, আলেক জানা যায়॥

প্রথম উদ্ধৃতিতে একটিও বিদেশি শব্দ নেই; তৎসম-তদ্ভব সব শব্দই পরিচিত, কিন্তু প্রয়োগ-কৌশলে রহস্যময় এক অচেনা জগতে চলে গেছে। 'অধর চাঁদ', 'ক্ষীরোধ-মিথুন', 'রসিক নাগরা', 'কূপ-নদীর জল', 'কারণ বারি', 'অচিন দল', 'চাঁদ-চকোরা', 'প্রেম-বাণ' ইত্যাদি পদগুচ্ছের বাহ্যার্থ চেনা, কিন্তু ভাবার্থ সম্পূর্ণ অচেনা। এগুলি অর্থভেদ করতে হলে বাউলতত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়। এটি বাউল সাধনার রীতি-পদ্ধতির গান। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ১২টি আরবি-ফারসি শব্দ আছে। লালনের এরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্ব মধ্যযুগে আলাওল ছাড়া অন্য কেউ প্রদর্শন করতে পারেন নি। ভাষা সম্পর্কে লালন শাহের নিজস্ব ধারণা ছিল, যা তাঁর গান থেকেই জানা যায় :

আরবী ভাষায় বলে আল্লা, ফারসীতে হয় খোদাতালা,
গড বলিছে যীশুর বেলা, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে।
মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় এ জগতে।
মনাতীত অধরে চিনতে ভাষা-বাক্যে নাহি পারে॥
আল্লা হরি ভজন পূজন সকলি মানুষের সৃজন;
অনামক অচিনায় কখন বাগীন্দ্রিয় না সম্ভবে॥

"মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় এ জগতে" — এ উপলব্ধিকে সারবস্তু করে লালন শাহ্ গান রচনা করেন বলেই আমাদের প্রতীতি হয়।

সমকালের সমাজের নানা বৃত্তিকর্মজীবী মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মকে বাউল কবিরা গানের ভাষায় চিত্রিত করেছেন; অবশ্য তা রূপক-প্রতীকের আবরণে। কৃষকের জমি চাষ করা, ঢেঁকিতে ধান ভানা, তাঁতির তাঁত বোনা, মাঝির নৌকা বাওয়া, জেলের মাছ ধরা, গাছির রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরি করা ইত্যাদি কাজের বাহ্যত বিবরণ আছে, মূলে আছে তত্ত্বকথা। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যায় :

(১) এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই,
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই।
তোর দেহ-জমির পাকা ধানে,
দেখ্ লেগেছে ছটা বাবুই॥
বহু কষ্টে করলি কৃষাণি,
এই মানবদেহ চৌদ্দ-পোয়া লাল জমিখানি।
তাতে ভক্তি-ফসল জন্মেছিল,
সব খেয়ে গেল হিংসা-চড়ুই॥
চেতন-বেড়া উপড়ে পড়েছে,
সব জায়গা আলগা পেয়ে
গরু-ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে।
এখন গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে,
দেখ তোর মাচা-ভরা বিঘ্ন পুঁই॥
কেন ভুঁয়ের এলে (<আল) বাঁধলি নে কুঁড়ে,
এখন চিন্তা-জ্বরে মরবি পুড়ে,
তোর পেটে হবে পিলুই॥
তোর আশা ভাঙল, ফসল গেল,
তুই ঠেকবি যখন, দেখবি তখন নিকেশের সময়।
কাঙাল যাদুবিন্দু ভণে, আমার এইটুকু ভরসা মনে,
আমি কুবীর-পদে মনকে থুই॥

(২) ওগো সুখের ধান ভানা ধনি,
এমন ব্যবসা ছেড় না।
কর কৃষ্ণপ্রেমের ভানা-কুটা,
কষ্ট তোমার থাকবে না॥
তোমার দেহ-ঢেঁকশালে
অনুরাগের ঢেঁকি বসালে,
ভজন-সাধন পাড়ুই দুটো দুদিকে দিলে,
আবার নিষ্ঠা আঁশকল লাগালে
ঢেঁকি চলবে, ও সে টলবে না,
ওগো সুখের ধান ভানা॥
রাগ বৈধী দুজন ভানুনী,
তাদের নাম কৃষ্ণ-মোহিনী,

তাদের একজন সদ্‌গোপের মেয়ে, একজন তেলেনী,
তারা ধান ভানে ভাল, জানে ভাল,
তাদের গায়ে সোনার গহনা॥
ঘরে বৃদ্ধ শ্রদ্ধা সেকেলে গিন্নি,
শুদ্ধমতি শুদ্ধরতি কুলো-চালুনি;
এবার কাম-কামনা ছেড়ে ঝেড়ে-ঝুড়ে
তুষ-কুড়ো চেলে লও না॥
রাগ-বিবেকের মুষল-আঘাতে
বাসনা-তুষ তোমার যাবে ছেড়ে পাড় দিতে দিতে,
চাল উঠবে সেঁটে, বিকার কেটে,
ঠিক যেন মিছরিদানা॥
শ্রীগুরু শ্রীমহাজনের ধান,
তাতে হবে রে সাবধান,
ষোল আনা বজায় রেখে করবে সমাধান,
তুমি লাভে লাভে কাল কাটাবে,
আসল যেন ভেঙ্গ না॥
গোঁসাই বলে, অনন্ত, তুই ধান ভানতে জানিস না,
ও তোর ঘটবে যন্ত্রণা;
পাপ-ঢেঁকি তোর মাথা নাড়ে, গড়ে পড়ে না।
দেখিস যেন বেহুঁশারে হাতে ঢেঁকি ফেলিস না॥

প্রথম গানে কৃষকের জমিচাষের এবং দ্বিতীয় গানে কৃষাণির ধানভানার চিত্র আছে। মাঠে জমিচাষ এবং গৃহে ধানভানা বাঙালির নিত্যদিনের গার্হস্থ্যকর্ম। জমিচাষ, ফসল ফলানো, ক্ষেত রক্ষা করা, ঘরে ফসল তোলা কৃষকের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে না পারলে জীবনে বিপত্তি নেমে আসে। অনুরূপভাবে কৃষকবধূকে ঢেঁকিতে ধানভানার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। দ্বিতীয় গানে ঢেঁকির গঠনশৈলী ও ধানভানার কৃৎকৌশল রূপক-প্রতীকের ভাষায় চমৎকার বাণীমূর্তি লাভ করেছে। এটা বাইরের রূপ, ভেতরে আছে কৃষ্ণপ্রেম সাধনার কথা। উভয় গানে বাউল কবির তীব্র অনুভূতির এবং লিপিকুশলতার ছাপ রয়েছে। তাঁরা বাংলার মানুষের খুব কাছে থেকে তাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশে তাদের হৃদয়ের স্পন্দনটি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁদের গানের কথায় ও ভাষায় সেসবের প্রতিফলন ঘটেছে।

বস্তুত বাউল কবিরাই ছিলেন জাতির আত্মার যথার্থ রূপকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই মন্তব্য করেন, "বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"[১২] লালন শাহ 'বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা'কে অঙ্গীকার করেই গান রচনা করেছিলেন, যার আবেদন গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে আজ বিশ্বহৃদয় স্পর্শ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

http:www.e-notes.com/homework/help/what/poetic/language/208065
wikipedia#Http#en.wikipedia.org/wik/poetic_diction

গ্রন্থপঞ্জি

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৪০৮। *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, অরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

ক্ষুদিরাম দাস, অজ্ঞাত। *বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

বিজয় গুপ্ত, ১৯৬২। *পদ্মাপুরাণ*, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৮৪। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত, *হারামণি*, ১৩শ খণ্ড, বাংলাদেশ লোকলোর পরিষদ, ঢাকা।

সুকুমার সেন, ১৯৬৬। *চর্যাগীতি-পদাবলী* (সম্পাদিত), ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা।

সুকুমার সেন, ১৯৭৫। *চণ্ডীমঙ্গল* (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নয়াদিল্লী।

Muhammad Shahidullah, 1966. *Budhist Mystic Songs* (ed.), Bengali Acadamy, Dhaka.

S. Ghoshal, Beginning of Secular Romance in Bengali Literature, Calcuta.